চতুর্থ সংখ্যা
ডিসেম্বর ১৯৯৫
পৌষ ১৪০২

লোক প্রশাসন সাময়িকী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

চতুর্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৌষ ১৪০২

সম্পাদনা পরিষদ

মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মোঃ শহীদুল হক
কাজী শামসুল আলম
আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান
কঙ্কা জামিল

সম্পাদক

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

লেখকের জ্ঞাতব্য

* লোকপ্রশাসন সাময়িকীতে লোকপ্রশাসন, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা, বিশ্লেষণ, আলোচনা অথবা অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ মৌলিক প্রবন্ধ ও পুস্তক সমালোচনা মুদ্রিত হয়

* মূলকপিসহ পাণ্ডুলিপির ৩ প্রস্থ সম্পাদক, লোকপ্রশাসন সাময়িকী, বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা–এই ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে

* লেখা রিপোর্ট সাইজের কাগজে এক পৃষ্ঠায় টাইপকৃত অথবা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত, পূর্বে অপ্রকাশিত এবং অনধিক ২০ পৃষ্ঠা হওয়া বাঞ্ছনীয়

* প্রাসঙ্গিক সূত্রসমূহ, পাদটীকা, প্রবন্ধের শেষে গ্রন্থপঞ্জি উল্লেখ করতে হবে। গ্রন্থপঞ্জিতে লেখক, গ্রন্থের নাম, প্রকাশক, বৎসর ও পৃষ্ঠা এবং সাময়িকীর ক্ষেত্রে লেখক, প্রবন্ধের নাম, খণ্ড, ইস্যুর সংখ্যা, বৎসর ও পৃষ্ঠা উল্লেখ করতে হবে

* লোকপ্রশাসন সাময়িকীতে মুদ্রিত লেখার জন্য পৃষ্ঠা প্রতি ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদানের বিধান রয়েছে

* অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
চতুর্থ সংখ্যা
ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৌষ ১৪০২

সূচীপত্র

১. নীতি বিশ্লেষণ ঃ ধারণাগত কাঠামো — ১
মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা

২. আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহি ঃ উন্নত ও উন্নয়নগামী কতিপয় দেশের অভিজ্ঞতা — ১১
কঙ্কা জামিল

৩. উন্নয়নে স্থানীয় উদ্যোগ ঃ একটি দৃষ্টান্ত — ২৭
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

৪. রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার ঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ — ৪৫
মোহাম্মদ আলী

৫. দেওয়ানী কার্যবিধির রূপরেখা — ৫৭
মোঃ হাসিবুর রহমান

৬. সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ ঃ কতিপয় সুপারিশ — ৬৯
মুহম্মদ আব্দুস সালাম

৭. আর্থব্যবস্থাপনা বিধি–প্রবিধি ও আইনকানুন — ৭৯
রণজিৎ কুমার চক্রবর্তী

৮. সার্ক ও আসিয়ান — ৮৯
শহীদুল হক

৯. নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা — ১০১
কাজী মোঃ শামসুল আলম

১০. জাতীয় জীবনে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব — ১০৭
আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান

১১. বাংলাদেশে দারিদ্রের স্বরূপ — ১২৩
গোলাম মোস্তাকীম

লেখক পরিচিতি

মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
উপ–পরিচালক, বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

কঙ্কা জামিল
সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন
উপ–পরিচালক, বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

মোহাম্মদ আলী
এষ্টেট অফিসার, লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

মোঃ হাসিবুর রহমান
পরিচালক, বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

মুহম্মদ আব্দুস সালাম
জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা

রণজিৎ কুমার চক্রবর্তী
উপ-মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

শহীদুল হক
উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

কাজী মোঃ শামসুল আলম
উপ–পরিচালক, বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান
উর্ধতন গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

গোলাম মোস্তাকীম
উপ–পরিচালক, বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
চতুর্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৌষ ১৪০২

নীতি বিশ্লেষণ ঃ ধারণাগত কাঠামো

মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা

১. ভূমিকা

'নীতি বিশ্লেষণ' (Policy analysis) চর্চার সূত্রপাত ঘটে ষাটের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এর প্রেক্ষাপট অনুসন্ধানের প্রচেষ্টায় মুখ্যত দু'টি বিষয় লক্ষণীয়। একদিকে ওই সময়ে রাষ্ট্রীয় খাতের ব্যাপক সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি নীতি ও কর্মসূচির ফলপ্রসূতা মূল্যায়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। অপরদিকে লোক-প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ জননীতি সম্পর্কে পঠন-পাঠন ও গবেষণায় বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ফলে জ্ঞানচর্চার শাখা (academic discipline) হিসেবে জননীতি ও নীতি বিশ্লেষণের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এ আগ্রহ ও জনপ্রিয়তা অন্যান্য পশ্চিমা দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। জননীতি সম্পর্কে গবেষণা ও পরামর্শদানের জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতে গড়ে ওঠে বিভিন্ন think tank.

২. নীতি (Policy) কী?

সমাজ, রাজনীতি, সরকার, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'নীতি' (Policy) কথাটি প্রায়শই উচ্চারিত হয়। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, নীতি বা Policy হচ্ছে সেইসব বৃহত্তর সিদ্ধান্ত, যার আলোকে ক্ষুদ্রতর সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

৩. জননীতি (Public Policy) কী?

ব্যাপক জনসাধারণকে সামনে রেখে সরকার যে নীতি গ্রহণ করে, এক কথায় তাই হচ্ছে জননীতি বা Public Policy. এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সরকার মূলত একটি রাজনৈতিক

কাঠামো এবং বিপুল সংখ্যক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান এর আওতাধীন। জননীতির কয়েকটি সুপরিচিত সংজ্ঞা এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য ঃ

"Public Policy is whatever governments choose to do or not to do." (Dye)

"Broadly defined, public policy is the relationship of a government unit to its environment" (Eyestone)

"Public policy is a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern. (Anderson.)

৪. জননীতির বৈশিষ্ট্য

জননীতি সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় সবিশেষ লক্ষণীয়। প্রথমত, জননীতি কোন লক্ষ্যহীন আচরণের বহিঃপ্রকাশ নয়। জননীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারের কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। দ্বিতীয়ত, জননীতি কতিপয় বিচ্ছিন্ন সিদ্ধান্তের সমষ্টি মাত্র নয়। জননীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের একটি কাঠামো ও ধারাবাহিকতা রয়েছে। তৃতীয়ত, জননীতি কেবল সরকারের কাঙ্ক্ষিত করণীয় বিষয়ের মধ্যেই সীমিত নয়, প্রকৃত কার্যক্রমও এর অন্তর্ভুক্ত। চতুর্থত, জননীতি ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু' টোই হতে পারে।

৫. জননীতির বিভিন্ন দিক

জননীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হওয়া দরকার ঃ

ক. নীতি সংক্রান্ত দাবি (Policy demands):- সরকারি বা বেসরকারি বিভিন্ন মহল থেকে প্রায়শ বিভিন্ন বিষয়ে সরকারি উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত কামনা করে দাবি উচ্চারিত হয়। এগুলোকে বলা হয় Policy demands. অনেক সময় এসব দাবি জননীতি প্রণয়নের ভিত্তি রচনা করে।

খ. নীতিগত সিদ্ধান্ত (Policy decisions) :- সরকারি কর্তৃপক্ষ জনগুরুত্ব-সম্পন্ন বিভিন্ন বিষয়ে যেসব দিক-নির্দেশনামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেগুলো হচ্ছে Policy decisions. নীতিগত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

গ. নীতি-বিবরণী (Policy statements) :- কোন নির্দিষ্ট জননীতি সম্পর্কে সরকার সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি সম্বলিত যেসব বিবরণী বা বিবৃতি প্রকাশ করে, সেগুলো হ'ল Policy statements. সাধারণত গণমাধ্যম এবং সরকারি প্রকাশনার মাধ্যমে এগুলো প্রচার করা হয়।

ঘ. নীতির ফলাফল (Policy outputs) :- বিঘোষিত জননীতির বাস্তবায়িত রূপ হচ্ছে Policy outputs. বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচিকে Policy outputs হিসাবে গণ্য করা যায়।

ঙ. নীতির প্রভাব (Policy outcomes) :- জননীতির আলোকে গৃহীত কর্মসূচি জনগোষ্ঠী তথা সমাজের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তা হ'ল Policy outcome. প্রতিটি জননীতির কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হ'ল, Policy outcomes থেকে তা প্রতিভাত হবে।

৬. জননীতি অধ্যয়নের উদ্দেশ্য

এতকাল রাষ্ট্রযন্ত্র, সরকার-কাঠামো এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানার মাধ্যম ছিল মূলত সনাতন রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও লোক-প্রশাসন। সাম্প্রতিককালে এর পাশাপাশি জননীতি ও নীতি বিশ্লেষণ পঠন-পাঠনের আগ্রহ ও প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ, প্রথমত, জননীতি অধ্যয়নে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ রয়েছে। দ্বিতীয়ত, জননীতি-চর্চার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় জীবনের বাস্তব সমস্যাবলীর সমাধানে সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পেশাগত জ্ঞানের সমন্বিত প্রয়োগ সম্ভব হয়। তৃতীয়ত, জননীতি বিষয়ক গবেষণা সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে যথাযথ নীতি ও কৌশল অবলম্বনের সুযোগ সৃষ্টি করে।

৭. নীতি–প্রক্রিয়া (Policy Process)

৭.১ নীতি–প্রক্রিয়া একটি ঘূর্ণায়মান চক্রের মত। জনজীবনে (Public life) একটি নতুন দাবি কিংবা বিষয়ের অবতারণার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ার শুরু। বিষয়টি যখন সরকার তথা জনসাধারণের মনোযোগ (Public attention) লাভ করে, তখনই এটি নীতিগত বিষয়ে (Policy issue) পরিণত হয়। এ পর্যায়টিকে বলা হয় বিষয়–নির্ধারণ (Agenda setting)। এর পরের স্তরটি হচ্ছে কার্যব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চাপ (Pressure of action)। এ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠী তাদের স্বার্থের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্ভাব্য বিকল্প কর্মপন্থাসমূহ চিহ্নিত করে (Identification of alternatives) এবং প্রতিটি পন্থার সুবিধা–অসুবিধা বিচার–বিশ্লেষণ করে (Cost-benefit analysis)। এ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক–সকল দিকই বিবেচনায় আনা হয়। সম্ভাব্য বিকল্পসমূহের চুলচেরা বিশ্লেষণের পর সরকার তার বিবেচনায় সর্বোত্তম কর্মপন্থাটি গ্রহণ করে। এটি একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত (Policy decision)।

৭.২ এতো গেল নীতি প্রণয়নের (Policy formulation) পর্যায়। এরপর আসে যথাযথ কর্মসূচির মাধ্যমে নীতি বাস্তবায়নের (Policy implementation) পর্যায়। অনেক ক্ষেত্রে সরকারি কার্যক্রমের সমর্থনে আইন প্রণয়ন (Legislation) ও অর্থ মঞ্জুরির (Appropriation) জন্য সংসদের শরনাপন্ন হতে হয়। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন কারণে বাস্তবায়ন–পর্যায়ে জননীতি ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করে। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ নীতি গ্রহণ করলেও বাস্তবায়নের কাজটি সাধারণত স্থায়ী প্রশাসন–যন্ত্র অর্থাৎ সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণই করে থাকেন। নীতি বাস্তবায়নের পর বিঘোষিত লক্ষ্যের নিরিখে নীতি মূল্যায়ন (Policy evaluation) এ করা হয়। অবশ্য কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে পরিবীক্ষণের (Monitoring) কাজও চলতে পারে।

৭.৩ মূল্যায়নের মাধ্যমে নীতির সফলতা ও ব্যর্থতা যাচাই করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের সামনে তিনটি পথ খোলা থাকে। যদি দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট নীতি ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে, তাহলে তা' বহাল থাকে। একে বলা হয় Policy continuation । যদি দেখা যায় যে, আংশিক লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে এবং কিছু কিছু ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়েছে, তাহলে নীতির সংশোধন বা পরিমার্জনের (Policy modification) প্রয়োজন হয়। আর যদি এরূপ প্রতিপন্ন হয় যে, সংশ্লিষ্ট নীতি কাঙ্ক্ষিত

লক্ষ্য অর্জনে সম্পূর্ণভাবে কিংবা বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছে, তবে এই নীতি বাতিল (Policy termination) করতে হবে। এ পর্যায়ে আবার সর্বসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং একে কেন্দ্র করে আরেকটি নীতিগত বিষয়ের (Poliy issue) অবতারণা হয়, যা' একটি নতুন বিষয়ের ভিত্তি স্থাপন করে (Agenda setting)।

৮. নীতি-বিশ্লেষণ (Policy analysis)

সংক্ষেপে বলতে গেলে, Policy analysis হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে একটি নির্দিষ্ট জননীতির বিচার-বিশ্লেষণ। "Public policy analysis involves observing politics and tracing how economic and social forces, institutions, people, events and circumstances interact. It offers a way of exploring how policies were chosen, and a method for judging their impact." (Davis, *et al*)

৯. নীতি-বিশ্লেষণের বিভিন্ন মডেল (Policy analysis models)

৯.০ সময়ের বিবর্তনে নীতি-বিশ্লেষণ সম্পর্কে বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা ও মডেলের বিকাশ ঘটেছে। জননীতি ও জনজীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণের জন্য এসব মডেল প্রয়োগ করা হয়। এগুলোর তুলনামূলক প্রভাব নির্ধারণ দুরূহ। বিভিন্ন মডেল বিভিন্ন শক্তির তৎপরতা ও মিথস্ক্রিয়ার উপর তুলনামূলকভাবে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। (সারণী ১ দ্রষ্টব্য।) নিচে কয়েকটি সুপরিচিতি মডেল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল ঃ

৯.১ প্রতিষ্ঠানবাদ (Institutionalism) ঃ এটি একটি সনাতনী মডেল। সাধারণত ধারণা করা হয় যে, রাজনীতি তথা রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম বিভিন্ন সংগঠন তথা প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয় মাত্র। এ মডেলে বিশ্বাসীগণ জননীতি আলোচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। একথা অনস্বীকার্য যে, কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত কোন নীতিই জননীতির রূপ পরিগ্রহ করে না। সরকার জননীতিকে তিনটি বৈশিষ্ট্য প্রদান করেন। এগুলো হচ্ছেঃ আইনসঙগত রূপ, সর্বজনীনতা এবং বাধ্যবাধকতা।

৯.২ দল তত্ত্ব (Group Theory) ঃ রাজনৈতিক কাঠামোর একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিভিন্ন দল বা গ্রুপের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া। এসব গ্রুপের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও তাদের পার্লামেন্টারি পার্টি, সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন, ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, মহিলা সংস্থা, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারক, গণমাধ্যম প্রভৃতি। বিভিন্ন বিষয়ে এসব গ্রুপ প্রায়ই পরস্পরবিরোধী ভূমিকা পালন করে থাকে। সরকারি প্রশাসন-যন্ত্রের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকাও অনেক সময় বিভিন্নমুখী হয়ে থাকে। জননীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এসব পরস্পরবিরোধী দলীয় স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হয়। Earl Latham এর মতে, " Public policy is actually the equilibrium reached in the group struggle at any given moment, and it represents a balance which the contending factions or groups constantly strive to tip in their favour."

সারণী ১ ঃ নীতি-বিশ্লেষণের বিভিন্ন মডেলের তুলনা

মডেলের নাম	যে দিকটির ওপর গুরুত্ব দেয়
Institutionalism	বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা
Group thory	পরস্পরবিরোধী interest group সমূহের মিথস্ক্রিয়া
Elite theory	এলিট শ্রেণীর মূল্যবোধের প্রাধান্য
Rational model	সম্ভাব্য বিকল্পসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম কর্মপন্থা গ্রহণ
Incrementalism	বিদ্যমান নীতিকে ভিত্তি হিসেবে নিয়ে স্বল্প মাত্রার পরিবর্তন
Mixed Scanning Model	মৌলিক সিদ্ধান্ত যৌক্তিক মডেলে, খুঁটিনাটি বিষয়ে স্বল্প বৃদ্ধির মতবাদ
Game theory	প্রতিপক্ষের মনোভাব দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ; কৌশল অবলম্বন
Systems theory	পরিবেশ, কাঠামো, পদ্ধতি, ফীডব্যাক।

৯.৩ এলিট তত্ত্ব (Elite Theory) : যদিও আদর্শগতভাবে জননীতি সংক্রান্ত দাবি জনসাধারণের মধ্যে থেকেই উথাপিত হওয়ার কথা এবং জননীতিতে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ইচ্ছাই প্রতিফলিত হওয়ার কথা; কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, সমাজের সুবিধাভোগী এলিট শ্রেণীই ব্যাপক জনমতকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। নীতি সংক্রান্ত দাবি সাধারণত তাঁরাই উথাপন করেন এবং জননীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁরাই সরকারকে প্রভাবিত করেন। সুতরাং জননীতিতে জনসাধারণের নয়, এলিট শ্রেণীর মূল্যবোধেরই প্রতিফলন ঘটে। Dye এর ভাষায় "Public policy may be viewed as the preferences and values of a governing elite."

সারণী ২ঃ যৌক্তিক মডেলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধাপসমূহ

১. সমস্যার সংজ্ঞায়ন;
২. সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর মূল্যবোধ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী চিহ্নিতকরণ এবং অগ্রাধিকার অনুযায়ী এগুলোর বিন্যাস;
৩. লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্ভাব্য বিকল্পসমূহ উদ্ভাবন;
৪. বিভিন্ন বিকল্পের মূল্য/অসুবিধা ও প্রাপ্তি/সুবিধা নিরূপণ;
৫. বিভিন্ন বিকল্পের মূল্য/অসুবিধা ও প্রাপ্তি/সুবিধার তুলনামুলক বিশ্লেষণ;
৬. দ্বিতীয় ধাপে উল্লিখিত মূল্যবোধ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে সবচাইতে লাভজনক/ সুবিধাজনক বিকল্পটি গ্রহণ।

৯.৪ যৌক্তিক মডেল (Rational Model) : Simon প্রবর্তিত এ মডেলটি সম্ভবত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সবচাইতে পরিচিত কাঠামো। যৌক্তিক জননীতি গ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে "to maximise net value achievement." (সারণী ২ দ্রষ্টব্য।) যখন Net value achievement এর কথা বলা হয়, তখন ধরে নেয়া হয় যে, সমাজের সংশ্লিষ্ট সকল মূল্যবোধ জানা আছে, কিছু কিছু মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য অপরাপর কিছু মূল্যবোধ ত্যাগ করতে হবে এবং সেক্ষত্রে হারানোর চাইতে প্রাপ্তির পরিমাণ বেশী। এখানে মূল্যবোধ বলতে অবশ্য জননীতির সাথে সংশ্লিষ্ট সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধকে বোঝায়।

৯.৫ স্বল্প বৃদ্ধির মতবাদ (Incrementalism) : সাইমনের যৌক্তিক মডেল সম্পর্কে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হ'ল এই যে, প্রক্রিয়াটি অবাস্তব। সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ চিহ্নিতকরণ এবং এগুলোর তুলনামূলক মূল্য নিরুপণের কাজটি সহজ নয়।

এর পরিপ্রেক্ষিতে Charles E. Lindblom উপস্থাপন করেন Incremental Model। এ মডেল অনুযায়ী নতুন জননীতি পূর্বতন জননীতির ধারাবাহিকতা মাত্র। নীতি প্রণেতাগণ বিদ্যমান জননীতিকে ভিত্তি হিসেবে ধরে স্বল্প মাত্রায় কিছু কিছু নতুন বিষয় যোগ করেন। এ ব্যবস্থায় পূর্বতন জননীতির বৈধতাকে স্বীকার করে নেয়া হয়।

৯.৬ মিশ্র অনুসন্ধান মডেল (Mixed Scanning Model): Amitai Etzioni প্রবর্তিত এ মডেলের সারকথা হ'ল জননীতির ক্ষেত্রে মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় যৌক্তিক মডেল অনুসারে এবং মৌলিক সিদ্ধান্তের আলোকে খুঁটিনাটি বিষয় নির্ধারিত হয় স্বল্প বৃদ্ধির মতবাদ অনুযায়ী।

৯.৭ খেলা তত্ত্ব (Game Theory): সাধারণত যুদ্ধ, শান্তি, আন্তর্জাতিক কূটনীতি, পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, দর-কষাকষি, মোর্চা গঠন প্রভৃতি প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে এ মডেল প্রয়োগ করা হয়। এসব ক্ষেত্রে কোন পক্ষ এককভাবে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। এক পক্ষের সিদ্ধান্ত নির্ভর করে অপর পক্ষের মনোভাবের ওপর। এ মডেলে 'পরাকৌশল' (Strategy) বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৯.৮ সিষ্টেম তত্ত্ব (Systems Theory): এ মডেলে জননীতিকে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার (Political system) ফসল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ ব্যবস্থাটি কাজ করে একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গসমূহ হচ্ছে পরিবেশ, কাঠামো ও পদ্ধতি। জনদাবি ও জনসমর্থন এখানে input হিসেবে কাজ করে এবং পরিবেশ, কাঠামো ও পদ্ধতি সম্বলিত সিস্টেমের ভেতর দিয়ে output হিসেবে বেরিয়ে আসে সরকারি সিদ্ধান্ত তথা জননীতি। পুরনো নীতির feedback নতুন নীতির input হিসেবে কাজ করে। (চিত্র ১ দ্রষ্টব্য।)

চিত্র ১ ঃ সিস্টেম মডেল

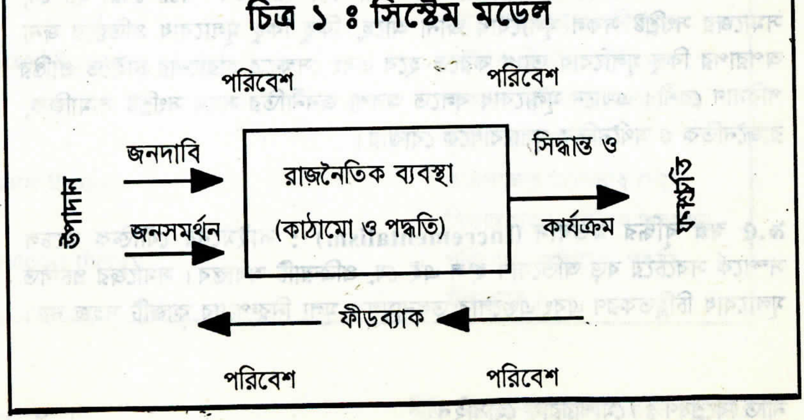

উপসংহারঃ

১০. একটি নির্দিষ্ট জননীতি আলোচনার উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ মডেলের প্রয়োগ সকল ক্ষেত্রে যথার্থ নাও হতে পারে। একই সঙ্গে একাধিক মডেলের আলোকে জননীতিকে বিশ্লেষণ করা যায়। Dye এর ভাষায় " although some policies appear at first glance to lend themselves to explain by one particular model, most policies are a combination of rational planning, incrementalism, interest group activity, elite preferenes, systemic forces, competition and institutional influences." বিভিন্ন মডেলের প্রাসঙ্গিকতা এবং তুলনামূলক গুরুত্ব নির্ভর করবে দেশ, কাল, পরিস্থিতি, নীতির প্রকৃতি এবং অংশত বিশ্লেষকের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর।

বিঃদ্রঃ প্রবন্ধটি লোকপ্রশাসন মডিউলে সহায়ক পাঠ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

BIBLIOGRAPHY

Anderson, James E. (1984), *Public Policy-Making*, 3rd edn., New York : Holt Rinehard & Winston.

Davis, G. *et al* (1988), *Public Policy in Australia*, Sydney : Allen and Unwin.

Dror, Yehezkel (1968), *Public Policy-Making Reexamined*, San Francisco : Chandler.

Dunn, William N. (1981), *Public Policy Analysis : An Introduction*, Englewood Cliffs : Prentice-Hall, Inc.

Dye, Thomas R. (1978), *Understanding Public Policy*, 3rd edn., Englewood Cliffs : Prentice-Hall, Inc.

Lindblom, Charles E. (1959), "The Science of Muddling Through", *Public Administration Review*, Vol. 19, No.2

— (1979), " Still Muddling, Not Yet Through," *Public Administration Review*, Vol. 39, No. 6

Simon, Herbert A. (1957), *Administrative Behaviour : A Study of Decision-Making Processes in Administration*, New York: Macmillan.

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৪র্থ সংখ্যা ডিসেম্বর ১৯৯৫ পৌষ ১৪০২

আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহি : উন্নত ও উন্নয়নগামী কতিপয় দেশের অভিজ্ঞতা

কঙ্কা জামিল

১. ভূমিকা

১.১ জবাবদিহি (Accountability) শব্দটি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। অক্সফোর্ড অ্যাডভান্সড লার্নারস ডিকশনারিতে জবাবদিহিকে "A requirement to give explanations for one's actions"[১] হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ সংজ্ঞা অনুসারে জবাবদিহি হচ্ছে সম্পাদিত কর্ম সম্পর্কে একজন ব্যক্তির ব্যাখ্যা দানের বাধ্যবাধকতা। Kernaghan এবং Langford এর মতে আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহি হচ্ছে "The obligation of public officials to answer for the fulfilment of assigned and accepted duties within the framework of the authority and resources provided."[২] অর্থাৎ আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহি হচ্ছে নির্ধারিত সম্পদ ও কর্তৃত্ব সীমার মধ্যে থেকে অর্পিত ও স্বীকৃত দায়িত্ব পালন সম্পর্কে সরকারি কর্মচারীদের জবাব দানের বাধ্যবাধকতা।

১.২ সাধারণত ব্যবসা ও অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বলে এসব প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহি প্রতিষ্ঠানের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের মালিকের নিকট চূড়ান্ত জবাবদিহি করা হয়। অন্যদিকে আমলাতন্ত্র / সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ যেহেতু জনগণের অর্থে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত, সেহেতু এখানে জবাবদিহি শুধু প্রতিষ্ঠানের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং এসব প্রতিষ্ঠান জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। তবে একটি দেশে জনগণের স্বার্থ কতটুকু সংরক্ষিত হবে, তা সে দেশের রাজনৈতিক প্রতিবেশের উপর নির্ভর করে। যেমন পৃথিবীর অনেক দেশে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিবেশ জবাবদিহিমূলক আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করেছে। Professor G. L. Peris-এর মতে .... "the essence of the democratic form of

government is that those wielding authority and making decision in the exercise of public power consistently remain answerable for their actions to the community from which they derive their power."[৩] অতএব একটি দেশের আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহির স্বরূপ পর্যালোচনা করতে হলে সে দেশের রাজনৈতিক প্রতিবেশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক।

১.৩ উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহি একটি জটিল প্রক্রিয়া। Ariyaratne Hewage-এর মতে আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহির সঠিক বাস্তবায়নের জন্য সরকারি কর্মচারীদের সরকারি আইন ও বিধিবিধান অনুসরণ ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট কাজের হিসাব প্রদান ছাড়াও নিম্নে বর্ণিত চারটি বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।[৪]

ক) সরকারি কর্মচারীদের নিজস্ব কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে জানতে হবে;

খ) "সর্বনিম্ন ব্যয় ও সর্বোচ্চ উৎপাদন" নীতি অনুসরণ করে নিজস্ব সংগঠনে দক্ষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালাতে হবে;

গ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করতে হবে;

ঘ) জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকা সরকারি কর্মচারীদের নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

২. আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

২.১ আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করার জন্য এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর দিকে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

২.২ আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে দুইভাবে বিভক্ত করা যায়: (১) অভ্যন্তরীণ ও (২) বহির্ভূত। আমলাতান্ত্রিক বিধি, প্রবিধি (যেমন আর্থ বিধি, শৃঙ্খলা ও আপীল বিধি প্রভৃতি), উর্ধ্বতন দপ্তরের নিকট অধস্তন দপ্তরের (কার্যক্রম সম্পর্কিত) লিখিত প্রতিবেদন প্রেরণ, উর্ধ্বতন দপ্তর কর্তৃক অধস্তন দপ্তর পরিদর্শন ও আর্থিক ব্যয়ের নিরীক্ষা প্রভৃতির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি নিশ্চিত করা হয়।

২.৩ সাধারণত রাষ্ট্রের সাংবিধানিক তিনটি শাখা—আইন সভা, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের মাধ্যমে আমলাতন্ত্রের বহিঃনিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংসদ রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ এবং আমলতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। সংসদীয় কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন দপ্তর সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুলতবি প্রস্তাব ও অন্যান্য প্রস্তাব গ্রহণ, বাজেট ও অন্যান্য আইন বিষয়ক বির্তক ও আলোচনা অনুষ্ঠান, বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি ও বিশেষ কমিটির সভা।

২.৪ সংসদীয় পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে একজন নামমাত্র রাষ্ট্রপতি থাকলেও রাষ্ট্রের প্রকৃত নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভার উপর ন্যস্ত থাকে। উভয় সরকার পদ্ধতিতে আমলাতন্ত্র সরাসরি রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের অধীনে ও নিয়ন্ত্রণে কাজ করে।

২.৫ আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিচার বিভাগ রিটের মাধ্যমে আমলাতন্ত্রের সম্ভাব্য স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে জনসাধারণের অধিকার ও স্বার্থ সংক্ষরণ করে। বাংলাদেশে নিষেধাদেশ, (Writ of Prohibition), কার্যাদেশ, (Writ of Mandamus), আটক–মুক্তির আদেশ (Writ of Habeas Corpus) ও পদাধিকার সম্পর্কে ঘোষণা (Writ of Quo Warranto) দ্বারা বিচার বিভাগ আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে। কোনও কোনও দেশে বিশেষ করে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশসমূহে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ গ্রহণ ও তা নিষ্পত্তির জন্য ওমবুড্‌স্‌ম্যান” নামক প্রশাসনিক আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কয়েকটি উন্নয়নগামী দেশে ” ওমবুড্‌স্‌ম্যান ” প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং কোনও কোনও দেশে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে।

২.৬ রাষ্ট্রের সাংবিধানিক তিনটি শাখা ছাড়াও মহা হিসাবরক্ষক কর্তৃক সরকারি ব্যয়ের নিরীক্ষা, সরকারি নীতি প্রণয়নে স্বার্থ দলের চাপ এবং স্বাধীন গণমাধ্যম জবাবদিহিমূলক আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।

২.৭ এ প্রবন্ধে মূলত আমলাতন্ত্রের বহিঃনিয়ন্ত্রণের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমলাতন্ত্রের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে (১) সংসদ, (২) মন্ত্রিসভা ও (৩) বিচার বিভাগের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমলাতন্ত্রের বহিঃনিয়ন্ত্রণ যেহেতু

রাজনৈতিক প্রতিবেশের উপর নির্ভরশীল সেহেতু কয়েকটি ভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিবেশে আমলাতন্ত্রের বহিঃনিয়ন্ত্রণের স্বরূপ তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। প্রবন্ধের প্রথমাংশে উন্নত বিশ্বের দুটি দেশে আমলাতন্ত্রের জবাবদিহি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়াংশে উন্নয়নগামী দুটি দেশের রাজনৈতিক প্রতিবেশ ও আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। উপসংহারে উন্নত ও উন্নয়নগামী বিশ্বের কয়েকটি দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশে জবাবদিহি আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. উন্নত বিশ্বের আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহি : যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের তুলনামূলক পর্যালোচনা

৩.১ উন্নত বিশ্বের রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক কাঠামোতে সাধারণ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। ফেরেল হেডি "পাবলিক অ্যাডমিনির্স্ট্রেশন : এ কমপারেটিভ পারস্পেক্টিভ" নামক গ্রন্থে উন্নত ও উন্নয়নগামী বিশ্বের রাজনীতি ও আমলাতন্ত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন।[৫] উন্নত বিশ্বের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

ক) রাজনৈতিক নেতৃত্ব দক্ষ ও বৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত;

খ) রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বিভাজিত, সুনির্দিষ্ট ও যুক্তিনির্ভর। সনাতন মূল্যবোধ ও সনাতনী এলিটদের ক্ষমতা কাঠামো বিলুপ্ত;

গ) রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের পরিসর ব্যাপক এবং সামাজিক চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ;

ঘ) রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের উৎসাহ ও অংশগ্রহণ বিদ্যমান।

উন্নত বিশ্বের আমলাতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

ক) আমলাতন্ত্রের কর্মপরিধি ব্যাপক ও জটিল। আমলাতন্ত্রে প্রায় সকল পেশার প্রতিনিধিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

খ) আমলাতন্ত্রের সদস্যদের মধ্যে পেশাদারী মনোভাব বিদ্যমান। একটি বিশেষ পেশায় নিযুক্ত থাকার কারণে আমলাদের মধ্যে পেশাদারি মনোভাব গড়ে ওঠে।

গ) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আমলাতান্ত্রিক পেশাদারিত্বের কারণে সমাজে রাজনীতি ও আমলাতন্ত্রের অবস্থান মোটামুটি সুনির্দিষ্ট।

ঘ) আমলাতন্ত্র নীতিগত প্রশ্নে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে কাজ করে।

৩.২ উন্নত বিশ্বের রাজনীতি ও আমলাতন্ত্রে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হলেও কোনও একটি দেশের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য সে দেশের আমলাতান্ত্রিক কাঠামোকে প্রভাবিত করে। এ পর্যায়ে ভিন্ন রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক ঐতিহ্য সম্বলিত দুটি দেশের আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহি সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। অস্থিতিশীল রাজনৈতিক প্রতিবেশ, অথচ দক্ষ ও স্থিতিশীল আমলাতান্ত্রিক কাঠামো সম্বলিত ফ্রান্স এবং স্থিতিশীল রাজনৈতিক প্রতিবেশ ও সীমিত আমলাতান্ত্রিক কাঠামো সম্বলিত যুক্তরাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহির ক্ষেত্রে আইন সভা, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের ভূমিকা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

আমলাতন্ত্র নিয়ন্ত্রণে আইন সভার ভূমিকা :

৩.৩ ফ্রান্সের সংসদ যুক্তরাষ্ট্রের সংসদের তুলনায় নিষ্ক্রিয়। ফ্রান্সে অধিকাংশ সরকারি নীতির সূত্রপাত ঘটে সরকারি দপ্তরে। সংসদ আমলাতন্ত্রের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদন করে। সংসদের আইন সংশোধন করার সীমিত ক্ষমতা, আমলাতন্ত্রকেন্দ্রিক বাজেট প্রক্রিয়া এবং সংসদীয় কমিটিগুলোর নিষ্ক্রিয়তা প্রভৃতি প্রমাণ করে যে ফ্রান্সের আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণে সংসদ তেমন কার্যকর ভূমিকা পালন করে না।[৬] অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ আইনের সূত্রপাত হয় আইন সভায়। বাজেট প্রক্রিয়ায় আইন সভার ভূমিকাই প্রধান। তা ছাড়া কংগ্রেসের বিশেষায়িত কমিটিগুলো আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহির ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।[৭]

আমলাতন্ত্র নিয়ন্ত্রণে নির্বাহী বিভাগের ভূমিকা :

৩.৪.১ যুক্তরাষ্ট্রে আইন সভা, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন (Separation of Power) নীতি অনুসৃত হয় বলে আমলাতন্ত্রের উপর রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সীমিত। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির আমলাতন্ত্রের উপর একটি মাত্র ক্ষমতা আছে-- তা হচ্ছে তিনি দপ্তরের প্রধানদের কাছ থেকে কোনও বিষয়ে লিখিত মতামত চাইতে পারেন। অন্যান্য ক্ষমতা যেমন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আমলাতান্ত্রিক নিয়োগ, বিভিন্ন দপ্তরের অর্থায়ন, বেতন প্রভৃতির ক্ষেত্রে আইন সভার

অনুমোদন প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রপতির নির্বাহী আদেশ ফেডারেল কোর্টে পর্যালোচিত হয়।

৩.৪.২ ষাটের দশক থেকে রাষ্ট্রপতির নির্বাহী দপ্তর Executive Office of the President (ইওপি) কে শক্তিশালী করে রাষ্ট্রপতির নির্বাহী ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়াস নেয়া হয়েছে। যেমন ইওপি' র চারটি প্রধান দপ্তর—the White House Office, Office of Management and Budget, the National Security Council এবং Office of Policy Development—এর পরিধি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট রেগ্যান ক্ষমতায় থাকাকালীন আমলাতন্ত্রের উপর রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাধিক কেবিনেট কাউন্সিল গঠন করেন। এ কাউন্সিলগুলি মন্ত্রিপরিষদের উপদল হিসাবে কাজ করে। রাষ্ট্রপতি অথবা তার অনুপস্থিতিতে মন্ত্রিপরিষদের একজন সদস্য কাউন্সিলগুলির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তা ছাড়া আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত রাজনৈতিক কর্মকর্তারা কাজ করেন। দপ্তরের স্থায়ী ও পেশাদার কর্মকর্তাদের কংগ্রেস ও বিভিন্ন স্বার্থ গোষ্ঠীর সাথে নিয়মিত মিথস্ক্রিয়া ঘটে থাকে। তাঁরা কংগ্রেস ও স্বার্থ গোষ্ঠীদের (interest group) সমর্থন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়ে ওঠেন। অতএব রাজনৈতিক কর্মকর্তাগণ দক্ষ ও দায়িত্বশীল না হলে পেশাদার কর্মকর্তারাই দাপ্তরিক নেতৃত্ব দান করেন।

৩.৪.৩ ফ্রান্সের প্রায় দুই শতাব্দীর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পর ১৯৫৮ সালে পঞ্চম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা আসে এবং আমলাতন্ত্রের উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়। এর পূর্বে আমলাতন্ত্র রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণমুক্ত ছিল বলা যায়। পঞ্চম প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি ও সংসদীয় সরকার পদ্ধতির একটি মিশ্র পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় এবং এতে সংসদের ক্ষমতা হ্রাস করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। এ সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সাত বছরের জন্য নির্বাচিত হন। তিনি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং সংসদ বাতিল করে নতুন নির্বাচন আহবান করতে পারেন। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ক্ষমতাশালী হলেও নীতি প্রণয়ন ও সরকারী দপ্তরের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসনে আমলাতন্ত্রই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এ সকল ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার ভূমিকা সীমিত । প্রতিটি দপ্তরে অবস্থিত Ministerial Cabinet মন্ত্রীকে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে উপদেশনা ও সহায়তা প্রদান করে। Ministerial Cabinet-এর প্রধান হিসেবে একজন উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকায় এ ক্ষেত্রেও সরকারি কর্মকর্তারা প্রধান্য বিস্তার করে।[৮]

আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণে বিচার বিভাগের ভূমিকা :

৩.৫.১ যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ আমলাতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। আমলাতন্ত্রের কর্মপরিধি ও স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ষাটের দশক থেকে আমলাতন্ত্রের ভোক্তা ও কর্মচারীদের মৌলিক অধিকার (Substantive right), আইনের চোখে সমতার অধিকার (Equal protection right) এবং আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করার অধিকার (Due process right) বৃদ্ধি করা হয়েছে। সরকারি কর্মচারী ও জনসাধারণের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আদালত অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তা ছাড়া সত্তরের দশক থেকে সরকারি কর্মচরীরা জনসাধারণের সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করলে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হন। এর পূর্বে সরকারি দায়িত্ব পালনকালে কোনও কর্মচারী দ্বারা জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ দান থেকে কর্মচারীরা নিঃশর্ত অব্যাহতি (absolute immunity) লাভ করতেন।

৩.৫.২ অন্যদিকে ফ্রান্সের Conseil Constitutional যুক্তরাষ্ট্রের আদালতের তুলনায় নিষ্ক্রিয়। তবে সত্তরের মাঝামাঝি সময় থেকে Conseil–এর কর্মতৎপরতা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে ১৯৭৯ সালের বাজেটকে অসাংবিধানিক হিসাবে ঘোষণা দেয়া এবং ১৯৮১ সালে ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদের দেয়া ক্ষতিপূরণের পরিমাণ পুনর্মূল্যায়ন করার নির্দেশ দেয়া।[৯]

৩.৫.৩ ফ্রান্সের আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহির ক্ষেত্রে প্রশাসনিক আদালত অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। Conseil d'etat (the council of state) প্রশাসন সম্পর্কিত সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে কাজ করে। জনসাধারণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাউন্সিল অফ স্টেট অথবা প্রশাসনিক জজের কাছে আপীল করতে পারেন। আইনবিদ অথবা কোর্ট ফি ছাড়াই এ সকল আদালতে আপীল করা যায়।

৩.৫.৪ উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ফ্রান্সের আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে আইন সভা, নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগের ভূমিকা কম। এর পেছনে একাধিক কারণ আছে।

৩.৫.৫ প্রথমত : স্থিতিশীলতা ফরাসি আমলাতন্ত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে চারশ' বছর ধরে সামন্ত রাজতন্ত্র থেকে চরম (absolute monarchy) রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকালে বাণিজ্যের প্রসার, সম্পদ আহরণ এবং সামাজিক ও

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাজতন্ত্রের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রসারিত ও কেন্দ্রীভূত প্রশাসন যন্ত্র/ রয়াল সার্ভিস প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নেয়া হয়। যদিও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পদসোপান ভিত্তিক একটি প্রশাসনিক যন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল তবু প্রশাসন যন্ত্র ও রাজতন্ত্র সর্বাধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা চতুর্দশ লুই -এর শাসনকালে । ফরাসি বিপ্লবের পর ফ্রান্স জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশের পর নেপোলিয়ন সামরিক প্রতিষ্ঠানের অনুসরণে আমলাতন্ত্রে কার্য বিভাগ, পদোসোপান ভিত্তিক জবাবদিহি, মেধা ভিত্তিক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, প্রভৃতি ধারণার প্রবর্তন করেন। তিনি সর্বোচ্চ মেধা ও সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন একাধিক Corps বা ক্যাডার সৃষ্টি করেন। এগুলিকে Grands Corps বলা হয়। এ কোরের সদস্যরা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি পূরণ করে। তা ছাড়া রাজনীতিতেও তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং একাধারে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পদে বহাল থাকতে পারে। ফ্রান্সের গত দুই শতাব্দী ধরে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ঘনঘন পরিবর্তন সূচিত হলেও নেপোলিয়ন প্রবর্তিত আমলাতান্ত্রিক কাঠামোতে অদ্যাবধি তেমন গুরুতর পরিবর্তন আসেনি। সমাজবাদী দলসহ ফ্রান্সের সকল ক্ষমতাসীন দলের জন্য একটি দক্ষ ও অনুগত আমলাতন্ত্রের সহযোগিতা অপরিহার্য ছিল। অন্য দিকে আমলাতন্ত্রের শীর্ষ স্থানীয় গ্র্যান্ডস কোরের সদস্যদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিমণ্ডলে যথেষ্ট প্রভাব থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনিক সংস্কার ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তারা বরাবর অনাগ্রহী থেকেছে। গ্র্যান্ডস কোরের সদস্যদের এ ধরণের অনমনীয় (rigid) মানসিকতাকে কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ (Michel Crozier এবং Ezra N. Suleiman) ফরাসি সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখেছেন। তাঁদের মতে ফরাসিরা প্রধানত শান্তিপ্রিয়, নিয়মতান্ত্রিক ও সংঘর্ষবিরোধী। যে প্রশাসন ব্যবস্থা অতীতে সংকট নিরসনে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে তা' পরিবর্তন করতে গিয়ে নতুন সংকটের ঝুঁকি নিতে চাননি প্রশাসনিক নেতৃবৃন্দ।[১০] তা ছাড়া আমলাতন্ত্রের স্বার্থবিরুদ্ধ সংস্কার/ পরিবর্তনকে আমলাতন্ত্র স্বীয় ক্ষমতা দ্বারা প্রতিহত করার প্রয়াস নিয়েছে । এখানে Corps de Mines-এর প্রসঙ্গ আনা যায়। ফ্রান্সে মাইনিং সেক্টরের গুরুত্ব হ্রাস পেলেও Corps de Mines- এর সদস্যগণ তাদের একতা ও উন্নত নেটওয়ার্ক -এর মাধ্যমে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিজেদের অবস্থান অক্ষুণ্ন রেখেছে।[১১]

৩.৫.৬ দ্বিতীয়ত : চরম রাজতন্ত্রের সময়কাল থেকে রয়াল সার্ভিস/ সিভিল সার্ভিস বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন একটি পেশা হিসাবে ফরাসি সমাজে প্রতিষ্ঠিত। জনগণ সরকারি কর্মচারীদের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ও সন্মানিত ব্যক্তি হিসাবে

বিবেচনা করে। অতএব তারা রাষ্ট্রের মুখপাত্র ও প্রশাসক হিসেবে কাজ করে, জনগণের সেবক হিসেবে নয়।[১২]

৩.৫.৭ তৃতীয়ত: ফ্রান্সের আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী । যার ফলে দেখা গেছে পর্যাপ্ত রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও আমলাতন্ত্র দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত থেকেছে। সির্ভিল সার্ভিসের বিভিন্ন কোর/ ক্যাডারগুলি আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। যেমন Conseil de Etat সরকার ও প্রশাসন সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করে এবং প্রশাসনিক আদালত হিসাবে কাজ করে। প্রশাসনিক আদালত হিসাবে এ কোর প্রশাসনিক কার্যকলাপ মুল্যায়ন ও বিচার করে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করে। তা ছাড়া Inspection des Finance রাষ্ট্রের আর্থিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সরকারকে সহায়তা করে এবং Cour des Comptes রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করে।

৩.৫.৮ চতুর্থত: ফ্রান্সে শিল্পায়ন ও গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষের পূর্বে আমলাতন্ত্র বিকশিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব এদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের উপস্থিতি অনস্বীকার্য ও অনিবার্য ছিল। ফ্রান্স পশ্চিমের অন্যান্য উন্নত দেশ যেমন যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় দেরিতে শিল্পায়ন শুরু করেছে। মূলত এ শতকের প্রথম দিকে ফ্রান্স একটি কৃষিপ্রধান দেশ থেকে শিল্পপ্রধান দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। শিল্পে অগ্রসর দেশগুলি যেভাবে স্বল্প প্রতিযোগিতা, স্বল্প মূলধন ও সনাতনী যানবাহন ব্যবস্থা প্রভৃতি দ্বারা শিল্প গড়ে তুলেছে ফ্রান্সের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। ফ্রান্সের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন হয়েছে। বৃহৎ ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য মূলধনের কেন্দ্রীভবন, রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ ও সহযোগিতার প্রয়োজন হয়েছে। তা ছাড়া কৃষির আধুনিকায়নের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়েছে।

৩.৫.৯ অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে ফ্রান্সের মত রাজতন্ত্র এবং কেন্দ্রীভূত ও শক্তিশালী প্রশাসন যন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীতে যুক্তরাজ্যে গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক মূল্যবোধ অনেকাংশে যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত। দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমলাতন্ত্র বিকাশ লাভ করায় আমলাতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে কাজ করতে হয়েছে। তৃতীয়ত, কৃষি ও শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগামিতা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে বাজার নির্ভর করেছে ও আমলাতন্ত্রের পরিধিকে সীমিত রেখেছে । পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য

পুঁজিবাদের নেতিবাচক প্রভাব আমলাতান্ত্রিক কর্ম পরিধিকে বিস্তৃত করেছে। জনকল্যাণ বিশেষ করে দরিদ্র ও সংখ্যালঘুদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমুখী কর্মসূচি গ্রহণ ও আমলাতন্ত্রের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (discretionary power) বৃদ্ধির ফলে বিংশ শতাব্দীতে এসে যুক্তরাষ্ট্রের আমলাতন্ত্র যথেষ্ট ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে।

৩.৫.১০ যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় পুঁজিবাদী সমাজের গণতন্ত্রকে কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । হেনরী এস. ক্যারিয়েল উন্নত পুঁজিবাদ ও সাংবিধানিক গণতন্ত্রের মধ্যে বিরোধের কথা বলেছেন। তিনি কংগ্রেস, প্রেসিডেন্ট, আমলাতন্ত্র, আদালত, সংবাদপত্র প্রভৃতির উপর ক্ষমতাবানদের বিশেষত ব্যক্তি মালিকানাধীন বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির আধিপত্য বিস্তারের বিষয়টি উপাত্তসহ উপস্থাপন করেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মত আমলাতন্ত্র মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে দায়বদ্ধ থাকে, আপামর জনসাধারণের কাছে নয়। যদিও এ মতবাদটি যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ, তথাপি পুঁজিবাদী সমাজের এ দিকটিও বিবেচনার দাবি রাখে ।

৪. উন্নয়নগামী বিশ্বে আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহি দক্ষিণ কোরিয়া ও ভারতের তুলনামূলক পর্যালোচনা

৪.১ ফেরেল হেডির মতে উন্নয়ণগামী বিশ্বের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

ক) রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন;
খ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন রাজনৈতিক দক্ষতার উপর নির্ভরশীল ;
গ) প্রায় প্রতিটি দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিদ্যমান;
ঘ) আধুনিক ও এলিটিস্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সংখ্যগরিষ্ঠ জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান বিদ্যমান;
ঙ) রাজনীতির তুলনায় আমলাতন্ত্র অধিক সংগঠিত ও প্রতিষ্ঠিত।

হেডির মতে উন্নয়নগামী বিশ্বের আমলাতন্তের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

ক) আমতলাতান্ত্রিক কাঠামো পশ্চিমা আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর অনুকরণে গঠিত, অধিকাংশ দেশে ঔপনিবেশিক আমলাতান্ত্রিক কাঠামো অপরিবর্তিত আছে;

খ) আমলাতন্ত্রে দক্ষ মানব সম্পদের অপ্রতুলতা উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম অন্তরায় হিসাবে কাজ করে;

গ) আমলাতন্ত্রের আইনানুগ ও বিধি প্রবিধির বাস্তব ব্যবহার সীমিত;

ঘ) আমলাদের মধ্যে পদমর্যাদা–প্রীতি, স্বজনপ্রীতি এবং দুর্নীতির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়;

ঙ) আমলাতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে কাজ করতে পছন্দ করে।

৪.২ এ পর্যায়ে দীর্ঘদিন সামরিক শাসনের অধীনে থাকা দক্ষিণ কোরিয়া ও দীর্ঘ দিন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অধীনে থাকা ভারতের আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহির ক্ষেত্রে আইনসভা, মন্ত্রিসভা ও বিচার বিভাগের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

৪.৩ আইন সভার ভূমিকা : ১৯৬১ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত সেখানে সামরিক শাসন বলবৎ ছিল। সামরিক শাসনামলে বিশেষ করে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ ও বিরোধী রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৭১ সালে সামরিক আইন জারি করে সংসদের ক্ষমতা লাঘব করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। অতএব সামরিক শাসনামলে আমলাতন্ত্রের উপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ ছিল না বললেই চলে। অন্যদিকে ভারতে স্বাধীনতার পর বেশ কয়েক বছর ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের তেমন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না এবং মন্ত্রিসভা মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। তখন সংসদে ক্ষমতাসীন দলের প্রাধান্য থাকলেও সংসদ বর্তমানের তুলনায় অধিক সক্রিয় ছিল। পরবর্তী কালে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বিরোধী দলসমূহ সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা ও সরকারকে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদানের পরিবর্তে মন্ত্রিসভার ব্যর্থতা প্রমাণের কলাকৌশল উদ্ভাবনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণে সংসদ কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়।[১৩]

৪.৪.১ নির্বাহী বিভাগের ভূমিকা : দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক শাসনামলে জাতীয় সংসদের ভূমিকা নগণ্য থাকায় রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভা আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ সময় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি অপসারণ না করে সরকার আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি কঠোর হস্তে দমন করার প্রয়াস নেয় । কিন্তু রাজনৈতিক পর্যায়ে দুর্নীতি বহাল থাকায় আমলাতন্ত্রকে দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব হয়নি। ১৯৯৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে দক্ষিণ কোরিয়ায় ৩২ বছর পর একজন বেসামরিক নেতা রাষ্ট্রপতি

হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই তিনি রাজনৈতিক দুর্নীতি দমন করার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন এবং মন্ত্রিসভায় সৎ ও নীতিবান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস নেন। তাঁর মতে রাজনৈতিক দুর্নীতি অপসারণ না করে প্রশাসন ও অন্যান্য ক্ষেত্রের দুর্নীতি অপসারণ করা সম্ভব নয়।

৪.৪.২ অপরদিকে যুক্তরাজ্যের অনুসরণে ভারতে মন্ত্রিসভার অধীনে আমলাতন্ত্রের নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে কাজ করার কথা। কিন্তু প্রধানত দুটি কারণে মন্ত্রিসভা আমলাতন্ত্রকে প্রত্যাশিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। প্রথমত ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভারতের আমলাতন্ত্র রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকায় কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থাপনা কৌশলে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পর আমলাতান্ত্রিক কাঠামোতে পরিবর্তন না আনার কারণে আমালাতন্ত্রের কর্তৃত্ববাদী স্বরূপ এখনও বজায় আছে। দ্বিতীয়ত আমলাদের নৈর্ব্যক্তিক আচরণ সে দেশেই সম্ভব যেখানে রাজনেতিক প্রতিযোগিতার পাশাপাশি রাজনৈতিক মূল্যবোধের প্রশ্নে ঐকমত্য আছে । কিন্তু ভারতে রাজনৈতিক মূল্যবোধের প্রশ্নে দ্বন্দ্ব ও গুরুতর মতপার্থক্য আছে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে ভিন্ন ও অনেক সময় সম্পূর্ণ বিপরীত রাজনৈতিক মতাদর্শের অধীনে কাজ করা আমলাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।[১৪]

৪.৫.১ বিচার বিভাগের ভূমিকা: দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক শাসনামলে বিচার বিভাগের ভূমিকা নগণ্য ছিল বলা চলে। অন্যদিকে ভারতে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় সরকারি কর্মচারীরা দেশের সাধারণ আইনের আওতাধীন এবং তাদের অবৈধ কার্যকলাপ দ্বারা জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হলে আদালত তাদের দোষী সাব্যস্ত করতে পারে এবং তাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে। কিন্তু কার্যত সরকারি কর্মচারীদের অবৈধ কার্যকলাপের জন্য রাষ্টকে দায়বদ্ধ করা হয়ে থাকে। তা ছাড়া বিচার প্রক্রিয়া ব্যয়বহুল, জটিল ও দীর্ঘ মেয়াদি হওয়ায় আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতার বহু ঘটনা আদালতে উথাপিত হয় না।

৪.৫.২ উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতে আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহির জন্য বহির্ভূত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকলেও তা আমলাতন্ত্রকে প্রত্যাশিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হচ্ছে না। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতা এবং জনগণের অসচেতনতা এর জন্য দায়ী । উন্নয়নগামী দেশগুলোর আমলাতন্ত্র ঔপনিবেশিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, উন্নয়ন প্রশাসনের জন্য তা উপযুক্ত নয়। উপরন্তু রাজনীতি জবাবদিহিমুলক নয় বিধায়

আমলাতন্ত্র জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মত ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করার সুযোগ পাচ্ছে। আবার রাজনীতি জবাবদিহিমূলক নয় কারণ ১) সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ অশিক্ষিত এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অসচেতন ২) জনসাধারণ বিশেষ করে দরিদ্র জনগণ সংগঠিত নয় এবং তাদের সাধারণত সংগঠিত হতে দেয়া হয় না। ৩) রাজনৈতিক দলগুলিকে অসংখ্য স্বার্থ গোষ্ঠীর সাথে দর কষাকষি করতে হয় না। কিছু ক্ষমতাবান ব্যক্তি ও স্বার্থগোষ্ঠীর সাথে সুসম্পর্ক থাকলেই চলে।[১৫]

৪.৫.৩ অন্যদিকে উন্নত দেশে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনীতি জবাবদিহিমূলক, কারণ সেখানে ১) জনগণ শিক্ষিত ও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন, ২) সকল স্তরে জনগণ নিজ নিজ স্বার্থগোষ্ঠীতে সংগঠিত ৩) নির্বাচনের আগেই রাজনৈতিক দলগুলোকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও দেশের সার্বিক অগ্রগতির জন্য দলীয় কর্ম পরিকল্পনা ঘোষণা করতে হয় এবং ক্ষমতায় যাবার পর এ সম্পর্কে তারা হিসাব দিতে বাধ্য হয়।[১৬]

৫. উপসংহার

৫.১ উন্নত ও উন্নয়নগামী কয়েকটি দেশের রাজনৈতিক প্রতিবেশ ও আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহির স্বরূপ আলোচনা করে দেখা যায়, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিবেশ যেমন জবাবদিহিমূলক আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে সহায়ক তেমনি একটি প্রশিক্ষিত ও দক্ষ আমলাতন্ত্র গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিবেশে প্রয়োজনীয়। উপরন্তু উন্নয়নগামী দেশে প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে আমলাতন্ত্রকে গণমুখী করা আবশ্যক। পাশাপাশি জনসাধারণকে শিক্ষিত ও সংগঠিত করে জবাবদিহিমূলক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করা প্রয়োজন।

৫.২ উপর্যুক্ত আলোচনার সূত্র ধরে বাংলাদেশে জবাবদিহিমুলক প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা যায় । বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এ দেশে গণতন্ত্রের চর্চা খুব সামান্যই হয়েছে। স্বাধীনতার প্রথম দুই বছর আমলাতন্ত্রকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে সরিয়ে রাজনীতিবিদদের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অধিষ্ঠিত করার প্রয়াস নেয়া হয়। রাষ্ট্রপতির ৯নং আদেশ জারি করে, সংবিধানে সরকারি কর্মচারীদের সাংবিধানিক রক্ষা কবচের অবসান ঘটিয়ে, প্রশাসনিক পদে রাজনৈতিক কর্মীদের আসীন করে আমলাদের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। কিন্তু ১৯৭৩ সাল থেকে দেশে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট নিরসনে সরকারের ব্যর্থতা আমলাতন্ত্রের উপর সরকারের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করে এবং পুনরায়

প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে ফিরে আসেন। ১৯৭৫ এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন ছিল।

৫.৩ ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করা সত্ত্বেও বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রতিবেশ সৃষ্টি এবং আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহির ক্ষেত্রে তেমন উন্নতি হয়নি । দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে বলা যায় বাংলাদেশে জবাবদিহিমূলক রাজনীতি ও আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা তখন সম্ভব হবে যখনঃ

ক) দেশের রাজনৈতিক দলসমূহ দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবে;

খ) সমাজজীবনে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং রাজনীতি প্রশাসন ও জনগণ সকলেই আইনের নিয়ন্ত্রণে থাকবে;

গ) রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক থাকবে এবং বিচার কাজ নিরাসক্ত ভাবে পালিত হবে;

ঘ) স্থানীয় সকল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মিত হবে এবং জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে;

ঙ) আমলাতন্ত্র দুর্নীতিমুক্ত হবে এবং সেবা প্রদানে সচেষ্ট থাকবে;

চ) গণমাধ্যমে স্বাধীনতা থাকবে যাতে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক অনিয়ম সর্ম্পকে জনসাধারণ সচেতন হতে পারে;

ছ) জনগণ শিক্ষিত ও সংগঠিত হবে এবং রাজনীতি ও প্রশাসনকে আইনসম্মতভাবে চলতে বাধ্য করবে।

৫.৪ বাংলাদেশের মতো দরিদ্র ও নানা সমস্যায় জর্জরিত দেশে গণতন্ত্র ও জবাবদিহিমূলক আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা নিঃসন্দেহে একটি কঠিন কাজ । তবে এ কঠিন কাজটি সমাধা না করলে আপামর জনসাধারণের জীবনে কোনও ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে না। এ সত্যটি উপলব্ধি করে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আমলাতন্ত্র, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং আপামর জনসাধারণকে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করতে হবে।

বি. দ্র. প্রবন্ধটি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের গণতন্ত্র ও সিভিল সার্ভিস মডিউলে সহায়ক পাঠ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Ariyaratne Hewage, *"Administrative Accountability of the Civil Service in Sri Lanka"* Paper presented in *"Asean Saarc Conference on Administrative and Financial Accountability"* organized by APDC and BPATC, 16-20 January, 1994, p.6.
2. Patricia A. Sto Tomas, *Accountability in Government: The Philippine case* "Paper presented in Asean Saarc Conference on Administrative and Financial Accountability organized by APDC, 16-20 January, 1994, p.1.
3. Ariyaratne Hewage, ,Opcit p.7
4. Ibid, P.9
5. Ferrel Heady, *Public Administration: A Comparative Perspective* (New York : Marcel Dekker Inc. 1984) pp. 176-177.
6. Jan-Erik Lane, *Bureaucracy and Public Choice* (London: Sage Publication, 1987) pp. 244-245.
7. David H. Rosenbloom, *Public Administration: Understanding Management, Politics and Law in the Public Sector* (New York: Random House, 1986) pp. 435-444.
8. Jan-Erik Lane, Opcit.
9. Ibid.
10. See, Ezra N. Suleiman, *"From Right to Left: Bureaucracy and Politicis in France" in Bureaucrats Policy Making* ed. Ezra N. Suleiman (New York : Holmes and Meier, 1984), p. 115-117. Heady , *Opcit* pp. 185-186 and "Comparing Bureaucracies" in Jan-Erik Lane (ed), Opcit.
11. Heady, *Opcit,* P. 186
12. Ibid, p. 179
13. C. P. Bhambhri, *Public Administration in India* ,(New Delhi:, Vikas Publishing House, 1973), pp. 225-226
14. Ibid

১৫. ড. শেখ মাকসুদ আলী, *প্রশাসনে স্বচ্ছতা"* *লোক-প্রশাসন বার্তা,* ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯৩।

লোক প্রশাসন সাময়িকী
৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৌষ ১৪০২

উন্নয়নে স্থানীয় উদ্যোগ ঃ একটি দৃষ্টান্ত

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

১. ভূমিকা

স্থানীয় উদ্যোগে সম্পদ সংগ্রহ, এই সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে সার্বিক আর্থ – সামাজিক অগ্রগতি এবং পরিকল্পিত উপায়ে উন্নয়ন সাধনের উপযোগী স্বাধীন ও স্বনির্ভর স্থানীয় কঠামো গড়ে তোলা দুরূহ কাজ । তবে আমাদের দেশে উন্নয়ন গতিধারার বিকাশে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ । স্থানীয় উদ্যোগে এধরনের স্বনির্ভর উন্নয়ন কাঠামো গড়ে তোলা জটিলও বটে।

পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া থানাধীন ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে এ ধরনের একটি বাস্তবানুগ অথচ আধুনিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামোকে সময়োপযোগী করা ও বাস্তবসম্মতভাবে পরিমার্জনের একটি নিরীক্ষার সন্ধানও পাওয়া যায় এ উদ্যোগের মধ্যে।

স্থানীয় উদ্যোগে এ ইউনিয়নে পাকা ও কাঁচা রাস্তার দু' ধারে অর্থকরী ফসলের চাষ এবং বনায়ন সম্পন্ন হয়েছে। ইউনিয়নের প্রায় সকল বাড়িতে সেনিটারী পায়খানা স্থাপিত হয়েছে। এ এলাকায় জনসাধারণ্যে কেউ ধুমপান করেনা । ইপিআই কর্মসূচি প্রায় ১০০ ভাগ সফল হয়েছে ; গণশিক্ষা কর্মসূচি এগিয়ে চলছে, ইউনিয়ন পরিষদকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পন্ন করে তোলার নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

ইউনিয়নের গরীব জনসাধারণের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টিরও প্রয়াস রয়েছে এই উদ্যোগের মধ্যে । এ সমস্ত বিরল সাফল্য অর্জিত হয়েছে বহিরাগত কোন সংস্থা অথবা দাতাগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য আর্থিক কারিগরী সহায়তা ছাড়াই । তবে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন, শিল্পায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকেনি। এই এলাকায় পর্দা প্রথা, সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার ইত্যাদি সমস্যাও বিরাজ করেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা যায়।

নেতৃত্বে স্থানীয় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সাফল্য অর্জনই হচ্ছে বাঘের সাথে লড়াই করে টিকে থাকা ভিটাবাড়িয়ায় বসবাসরত জনসাধারণের প্রকৃত সাফল্য। এজন্য কর্মপোযোগী একটি নতুন ও আধুনিক কাঠামোও তারা দেশবাসীর জন্য উপহার দিয়েছে। প্রয়োজন এই কর্মসূচি সৃজনশীলভাবে দেশের অন্যত্র প্রয়োগ করা।

বিঃ দ্রঃ প্রবন্ধটি বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের লোক প্রশাসন মতিউলে পাঠ্যবিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. তোফয়েল আহম্মেদ ও আব্দুল কাদের, *'স্থানীয় সরকারের যুগসন্ধিক্ষণঃ কাঠামো কার্যগত পুনর্গঠণের আলেকে কিছু সুপারিশ,'* বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী,কুমিল্লা, ১৯৯৩।

২. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *'গ্রাম উন্নয়ন পরিক্রমা'*, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর, বৈশাখ ১৪০১।

৩. তোফায়েল আহম্মেদ, *সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির পটভূমি নীতি ও কৌশল একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা* , বার্ড, কুমিল্লা, জানুয়ারী ১৯৯৩।

৪. ত্রয়োদশ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের *গ্রাম সমীক্ষা প্রতিবেদনঃ ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন* , বিপিএটিসি,জুলাই ১৯৯৪।

৫. ভান্ডারিয়া থানার বিভিন্ন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও পরামর্শ।

৬. খান এনায়েত করিম, *গ্রাম উন্নয়ন পরিষদের রূপরেখা,* ভান্ডারিয়া পিরোজপুর, ১৯৯৫।

৭. ডাঃ যোবায়দা হান্নান, *স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়নঃ আশার কোটা গ্রাম ও কুমিল্লা ডায়াবেটিক হাসপাতাল,* কুমিল্লা। ১৯৯৫

৮. জাহাঙ্গীর আলম জনি, *তাঁত, গ্রামীণ শিল্পায়ন ও নয়াকৃষির কিছু অভিজ্ঞতা'* টাঙ্গাইল, ১৯৯৫।

৯. তোফয়েল আহম্মেদ, মোস্তফা কামাল ও তৈয়ব আলী ভুঁইয়া , *'উন্নয়ন ও সংহতির জন্যে পরিবার কাঠামোর গণতন্ত্রায়ন,* বার্ড, কুমিল্লা, মে ১৯৯৪।

ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের এই দৃষ্টান্ত দেশের উন্নয়নে আলোর নিশানা হয়ে উঠতে পারে বিবেচনা করে এবিষয়ে অনুসন্ধান পরিচালনায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই অনুসন্ধানের ভিত্তিতে স্থানীয় উন্নয়নের কোন্ কোন্ বিষয়ে উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে, এসব বিষয়ে কতটা সাফল্য অর্জিত হয়েছে, এই কার্যক্রমে জনগণের আংশগ্রহণ কতটা এবং কি ধরনের এসকল বিষয়ে এই নিবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।

১.১ নিবন্ধ প্রণয়নের যৌক্তিকতা

গ্রাম উন্নয়নের প্রচেষ্টা আমাদের দেশে নতুন নয়। পল্লী উন্নয়ন একাডেমীসহ বিভিন্ন সংস্থা এ বিষয়ে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসমস্ত উদ্যোগ বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠীর সহায়তায় নিরীক্ষাধীন রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এসমস্ত মডেল আরোপিত বলে প্রতিভাত হয়। প্রাথমিক অনুসন্ধানে ভিটাবাড়িয়ার উদ্যোগ ভেতর থেকে অংকুরিত এবং স্বতঃস্ফূর্ত মনে হয়। স্পষ্ট হয়ে উঠে এই উদ্যোগের স্বাতন্ত্র্য। তবে এসম্পর্কে চূড়ান্ত কোন মন্তব্য করা সময় ও তথ্যসাপেক্ষ বিষয়। ব্যাপক গবেষণা অথবা সমীক্ষা পরিচালিত হলে স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়নের এই প্রক্রিয়া চিহ্নিতকরণ সম্ভব হতে পারে বলে মনে হয়।

উল্লিখিত বাস্তবতার আলোকে (ক) স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভিটাবাড়িয়ায় অনুসৃত পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণ ,(খ) স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহের পদ্ধতি চিহ্নিতকরণ, এবং (গ) চিহ্নিত পদ্ধতি অন্যান্য স্থানে প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে পর্যালোচনার লক্ষ্য সামনে রেখে এই নিবন্ধ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.২ নিবন্ধ প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পদ্ধতি

নির্ধারিত এলাকায় সরজমিন পরিদর্শন করে অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে এই নিবন্ধটি প্রণীত হয়েছে। অনুসন্ধান কালে জনসাধারণের সাথে ব্যাপক মত বিনিময়, হাট, বাজার, সভা , সমিতি ও বিভিন্ন স্থানে গমন, বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ ও প্রত্যক্ষকরণের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতাই এর মূল উপজীব্য ।

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় উদ্যোগে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সাফল্য সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা, সংশ্লিষ্ট ভিন্নমত পোষণকারী ব্যক্তিবর্গ এবং গোষ্ঠীর সাথে মতামত

বিনিময় করা হয়। মতামত বিনিময়ে কাঠামোহীন সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

১.৩ নিবন্ধের সীমাবদ্ধতা

এই নিবন্ধে আলোচিত বিষয়সমূহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট । সাধারণতঃ এসমস্ত বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সুদূর প্রসারী ফলাফল সৃষ্টি করে থাকে , যা তাৎক্ষণিকভাবে চিহ্নিত অথবা নিরুপণ করা সম্ভব নয়। বর্তমান নিবন্ধে এ ধরনের সীমাবদ্ধতা অবধারিতভাবেই রয়ে গেছে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নিবন্ধটি রচিত। যার ফলে কোন সমস্যার স্বরূপ উদঘাটন এবং গৃহীত পদক্ষেপের বাস্তব চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও এই নিবন্ধের সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে।

২. ভিটাবাড়িয়ার স্থানিক বর্ণনা

বরিশাল বিভাগের সুন্দরবন সংলগ্ন সমুদ্র তীরবর্তী জেলা পিরোজপুর। এই জেলার ভান্ডারিয়া থানার উত্তরপূর্ব দিকে 'পুনা' এবং তার শাখা 'কচা' নদী দ্বারা বেষ্টিত ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন। ইউনিয়নের লোকসংখ্যা ২১,১১৭ জন। মোট গ্রামের সংখ্যা ৪টি: শিয়ালকাঠি, মেদিরাবাদ–তারাবুনিয়া, উত্তর ভিটাবাড়িয়া এবং দক্ষিণ ভিটাবাড়িয়া । ইউনিয়নে মৌজার সংখ্যা ৪টি । প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩টি, মাদ্রাসার সংখ্যা ১৫টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩টি, গভীর ও অগভীর নলকূপের সংখ্যা ২৩৫টি, সমাজকল্যাণ কেন্দ্র ১টি, পাকা ইট বিছানো সড়ক ৫টি (১০ কি: মি:) এবং কাঁচা সড়ক ৫টি (৩০ কি:মি:) । ইউনিয়নটিতে বিদ্যুৎ সরবারহের ব্যবস্থা রয়েছে।

জোয়ার ভাটা এলাকায় অবস্থিত এই ইউনিয়নের অধিবাসীদের পেশা কৃষিকাজ, সুন্দরবনে বাওয়ালীর কাজ, নৌকা চালানো, গোলপাতা হোগলার ব্যবসা করা ইত্যাদি। এলাকার প্রধান ফসল ধান, পান, কলা, সুপারী, নারিকেল, কলাই, পেঁপে,পেয়ারা প্রভৃতি। অবস্থানগত কারণেই অসীম সাহসী এই এলাকার লোকজন। এলাকার প্রবীণ প্রায় সকল পুরুষেরই সুন্দরবনে গিয়ে গোলপাতা সংগ্রহের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এদের অনেকের আবার রয়েছে বাঘের সাথে লড়াইয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, কারো বা নিকটাত্মীয়, পিতা, ভাই বা জ্ঞাতি বাঘের থাবায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। একটু আলাপ করলেই বুঝা যায় সুন্দরবনে নদীতে কুমীর, ডাংগায় বাঘ আর সর্প সঙ্কুল

পরিবেশে বাওয়ালী হওয়ার নেশা এদের রক্তে লেগে আছে। ছোট ছোট নদী আর খালে ভরপুর ইউনিয়নটি। অতিথি পরায়নতা এবং বিপদে আপদে পীর মুর্শিদের দোয়া কালাম ইত্যাদিতে জনসাধারণের গভীর বিশ্বাস। মহিলারা অত্যন্ত পর্দানশীন। চলাফেরা করেন সাধারণতঃ বোরখা পরে এবং প্রায় অবধারিতভাবেই প্রত্যেকের হাতে থাকবে একটি ছাতা। এই ছাতা সব সময়েই যে রোদ বৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য তা নয়, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পথে প্রান্তরে পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যই তা ব্যবহৃত হয়। এমনকি স্কুলগামী বালিকারাও এর ব্যতিক্রম নয়। এলাকার প্রায় ৫০% মানুষ মুসলমান ধর্মাবলম্বী, বাকী প্রায় ৩০% হিন্দু। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বিদ্যমান। কৃষি শ্রমিকের গড়পড়তা মজুরী ৪০টাকা। সুন্দরবনে বাওয়ালীর কাজে পারিশ্রমিক তুলনামূলকভাবে বেশী। এলাকায় বহু বিবাহের প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশী। অধিকাংশের সন্তান সংখ্যা ৫/৬ এর অধিক। জনসংখ্যার ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে কম।

ভান্ডারিয়া নদীবন্দর হিসেবে অনেকদিন আগে থেকেই প্রসিদ্ধ। কলা এবং পান বোঝাই নৌকা, লঞ্চ ও কার্গো প্রতিদিন রাজধানী ঢাকাসহ বাংলাদেশের অন্যান্য প্রান্তে চলাচল করে এই নদীবন্দর থেকে। ভান্ডারিয়া থানায় ইউনিয়ন সংখ্যা ৭টি, তারমধ্যে ভিটাবাড়িয়া অন্যতম। আর্থিক দিক দিয়ে ইউনিয়নটি বাংলাদেশের আর দশটি ইউনিয়নের মতই। গরীব জনগোষ্ঠীর সংখ্যাই অধিক । তবে বাংলাদেশের পেক্ষাপটে অবস্থাপন্ন লোকের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য বলতে হবে।বেশীর ভাগ বাড়ীঘর সুন্দরবনের, গোলপাতার ছাউনী দিয়ে নির্মিত।

৩. গৃহীত কার্যক্রম

৩.১ গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (গ্রাউক)

ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে ৪টি গ্রাম, (১) উত্তর ভিটাবাড়িয়া (২) দক্ষিণ ভিটাবাড়িয়া (৩) উত্তর শিয়ালকাঠি এবং (৪) মেদিরাবাদ তারাবুনিয়া। ১৯৯৩ সনের হিসাব অনুসারে ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা ২১, ১১৭ জন। বিদ্যমান স্থানীয় সরকার কাঠামো অনুসারে ইউনিয়নে মোট ৩টি ওয়ার্ড এবং ৯জন নির্বাচিত ইউপি সদস্য রয়েছেন।

স্থানীয় উদ্যোগে ইউনিয়নটির ৩টি ওয়ার্ডের প্রত্যেকটির অধীনে ১০টি করে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (গ্রউক)[১] গঠন করা হয়েছে। এধরনের প্রতিটি কমিটিতে পরিবার সংখ্যা ৮০ থেকে ১০০টি। এভাবে সমগ্র ইউনিয়নে মোট ৩০টি গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়।

গ্রাম উন্নয়ন কমিটির কাঠামো

প্রধান উপদেষ্টা	ঃ	১জন (ইউপি চেয়ারম্যান)
সমন্বয়ক/ উপদেষ্টা	ঃ	১জন (ইউপি সদস্য)
সভাপতি	ঃ	১জন
সম্পাদক	ঃ	১জন
কোষাধ্যক্ষ	ঃ	১জন
সদস্য	ঃ	৪জন
মোট		**৯জন**

প্রতিটি কমিটির আওতাভূক্ত এলাকায় ৭জন করে অধিবাসী গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সদস্য। ইউনিয়ন পরিষদের সংগে যোগাযোগ ও সমন্বয় বজায় রাখার জন্য সংশিষ্ট ওয়ার্ডের ১ জন নির্বাচিত ইউপি সদস্য এবং ইউপি চেয়ারম্যানকে কমিটির সাথে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। একটি ওয়ার্ডে ১০টি গ্রাম উন্নয়ন কমিটি রয়েছে। ৩ জন নির্বাচিত ইউপি সদস্য ঐ ১০টি গ্রাউকের সমন্বয়ক বা উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

১৯৯৪ সালে নতুনভাবে মূল্যায়ন করে প্রতি ওয়ার্ডে গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সংখ্যা ৯টি করে বিন্যস্ত করা হয়েছে। ফলে ১ জন ইউপি সদস্য ৩টি গ্রাউকের সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন। বর্তমান কাঠামোয় গ্রাউকের সদস্য সংখ্যা ৯ থেকে ১১ তে উন্নীত করা হয়েছে। প্রতি গ্রামউন্নয়ন কমিটিতে গ্রামের ১ জন বর্ষীয়ান ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে উপদেষ্টা পদে এবং ১ জনকে সদস্য পদে মনোনীত করা হবে। নতুন কাঠামোতে বিভিন্ন পেশা থেকে প্রতিনিধি গ্রহণ এবং কমপক্ষে ১ জন সদস্য মনোনয়নের ব্যবস্থা রয়েছে।১৯৯২

[১] গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (গ্রাউক) ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে স্থানীয় উদ্যোগে গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই গ্রাউককে ঘিরেই ইউনিয়নের অন্যান্য সকল কর্মকান্ড আবর্তিত হচ্ছে। গরুত্ব বিবেচনা করে গ্রাম উন্নয়ন কমিটির বিস্তরিত বিবরণ এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

সালে প্রথমবারের মত প্রতি গ্রামে পূর্ব ঘোষণা দিয়ে সবার উপস্থিতিতে প্রত্যক্ষ মাতমত ও হাত তোলা পদ্ধাতির মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠিত হয়েছে। ভবিষ্যত কমিটি গঠনে পরোক্ষ মতামত গ্রহণের পদ্ধতি চালু হবে বলে জানা গেছে।

৩.১ গ্রাম উন্নয়ন কমিটির কার্যক্রম

নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রাম উন্নয়ন কমিটি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে ঃ

ক) রাত্রিকালীন প্রহরার মাধ্যমে গ্রামের চুরি ডাকাতি রোধ ও নিরাপত্তা বিধান।

খ) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ;

গ) সরকারী ও খাস জমিসহ সকল রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ, পরিচর্যা এবং বেকার দরিদ্রদের আয়ের সংস্থানকরণ

ঘ) ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎস সৃষ্টিতে সহায়তা করা

ঙ) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকরণ

চ) নলকূপের পানি পান নিশ্চিতকরণ

ছ) স্ল্যাবযুক্ত পায়খানা ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

জ) মানবসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন পেশা ও ট্রেড ভিত্তিক স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ

ঝ) প্রকাশ্যে ধূমপান ও ধূমপানসামগ্রী বিক্রি বন্ধকরণ

ঞ) সালিসের মাধ্যমে মামলা প্রবণতা হ্রাসকরণ ও সামাজিক শৃংখলা বৃদ্ধিকরণ

ট) সাময়িকভাবে ছাগল পোষা নিবারণ এবং গরু, মহিষ বাড়ীতে বেঁধে রেখে পালন নিশ্চিকরণ

ঠ) পোনামাছ ধরা বন্ধকরণ ও সমবায়ভিত্তিক মৎস্য চাষ বৃদ্ধিকরণ

ড) রবিশস্যের আবাদ বৃদ্ধির জন্য সাময়িকভাবে বাঁধ নির্মাণে সমবেত প্রচেষ্টা গ্রহণ

ঢ) বিলের/ ক্ষেতের জোঁক নিধন এবং বলদ ও মহিষের অসুখ ও অকালমৃত্যু রোধকরণ

ণ) সকল নাগরিককে স্ব স্ব ধর্মীয় উপাসনা ও কার্যক্রমে উদ্ধুকরণ।

৪. নেতৃত্ব

ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব খান এনায়েত করিম পরপর দুটি নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁকে চেয়ারম্যান বংশের ছেলে বলা হয়। কারণ, তাঁর পিতামহ ও পিতা যথাক্রমে বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে একাধিকবার চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন, বৃটিশ আমল থেকে এযাবত সাকুল্যে ৪টি টার্মে অন্য লোক চেয়ারম্যান হয়েছিলেন, বাকী সময়গুলোতে এই পরিবারেই পদটি সংরক্ষিত হয়েছে। উওরাধিকার সূত্রের নেতৃত্ব জনাব খানের আমলে অধিকতর শক্তিশালী হয়েছে। তিনি একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা এবং একটি রাজনৈতিক দলের থানা পর্যায়ের নেতা ছিলেন। তাঁর পরিচিতির গণ্ডী ব্যাপক এবং তিনি বলিষ্ট নেতৃত্ব ক্ষমতার অধিকারী। ব্যক্তি জীবনে তিনি অমায়িক, মিশুক ও পরোপকারী। বংশ পরিচয়, রাজনৈতিক পরিচিতি, ব্যক্তিগত আচরণ ও নিষ্ঠা তাঁর কার্যক্রম পরিচালনা সহজতর ও ফলপ্রসূ করেছে।

জনাব এনায়েত করিমের নামে ব্যাংক ঋণ নেই এবং তিনি অন্যকে ঋণ প্রদানের জন্য কোন তদ্বির করেন না বলে স্থানীয় সোনালী ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজারগণ জানিয়েছেন। কৃষি বিভাগের থানা কর্মকর্তার মতে তিনি তার সুদীর্ঘ কর্মজীবনে এধরনের কর্মতৎপর, বিচক্ষণ এবং কুশলী নেতৃত্ব আর কোন ইউনিয়ন বা থানায় দেখেননি। কয়েকজন সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীর সাথে আলাপকালে তাঁরা মত প্রকাশ করেন, জনাব খান এনায়েত করিমের নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা বরিশাল বিভাগে হাতে গোনা কতিপয় শীর্ষ স্থানীয় নেতার সমপর্যায়ের। তাঁর বিরুদ্ধে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এমন একজন পরাজিত প্রার্থীর মতে জনাব এনায়েত প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা সম্পন্ন একজন ব্যক্তিত্ব। তবে কয়েকজন ব্যক্তি তাঁকে একরোখা, গোঁয়ার এবং স্বৈরাচারী বলে চিহ্নিত করেছেন। তাদের ভাষায় 'চেয়ারম্যানের পেটোয়া ও সন্ত্রাসী বাহিনীর ভয়ে এলাকার লোকেরা অত্যাচার সহ্য করে, প্রতিবাদ করেনা এবং মুখ খোলে না, চেয়ারম্যান একজন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক, তিনি নিজের মতামত অন্যের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেন। তবে অনুসন্ধান কালে জানা যায় এ ধরনের মতামত পোষণকারীর সংখ্যা নগণ্য এবং তাদের দাবীর যৌক্তিক ভিত্তি জোরালো নয়।

৫.পর্যালোচনা

৫. ১ সৃজনশীল উদ্যোগ ঃ ভিটাবাড়িয়াতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তা থেকে দেখা যায় যে স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃত্ব সৃজনশীল , উদ্যমী এবং নিবেদিতপ্রাণ হলে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ এবং তা সফল করা সম্ভব। এ জন্য সম্পদ সংগ্রহ এবং কাঠামোগত প্রতিকূলতা থাকলেও সৃজনশীলতা, সততা এবং সদিচ্ছা দ্বারা তা অতিক্রম করা সম্ভব। যেমন ভিটাবাড়িয়াতে সামাজিক প্রণোদনা সৃষ্টির মাধ্যমে রাস্তার ঢালের পতিত জমিতে অর্থকরী ফসল কলার চারা রোপণের মাধ্যমে একটি প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছিল। ধীরে ধীরে এই প্রক্রিয়া স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিস্তৃত হয় এবং আগ্রহের সৃষ্টি করে। এই উদ্যোগ থেকে কৌশলী নেতৃত্ব (এক্ষেত্রে ইউপি চেয়ারম্যান) স্থানীয় সরকারের তহবিল গঠনের জন্য কলাচাষীদের উপর (কলার ঝাড় প্রতি ৩ টাকা হারে) ২ বৎসর মেয়াদী কর নির্ধারণ করেন। সমগ্র ইউনিয়নে ১ লক্ষ কলার চারা রোপণের পরিকল্পনা করা হয়। এভাবে এই উদ্যোগ থেকে স্থানীয় পর্যায়ের অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদের জন্য বাৎসরিক ৩ লক্ষ টাকা আয়ের একটি সম্ভবানাময় উৎস সৃষ্টি হয়। একেকটি কলাগাছ থেকে একজন চাষী বৎসরে গড়ে ৭০ টাকা আয় করে থাকেন। ৫০ ঝাড় কলাগাছ লাগিয়েছেন এরকম একজন চাষীর ২ বৎসরে ৭ থেকে ১০ হাজার টাকা নগদ অর্থ আয় হয়। এই সময়ের জন্য চাষীর ওপর ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কলার ঝাড় প্রতি ৩ টাকা করে কর নির্ধারিত হয় । যেহেতু কলা একটি অর্থকরী ফসল, চাষীর নগদ প্রাপ্তির সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে এই কর আদায় অসম্ভব মনে হয় না।

৫.২ গ্রাউক গঠনের প্রাথমিক ভিত্তি ঃ ১৯৯২ সালে ভিটাবাড়িয়া এলাকায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত নাজুক। বিশেষ করে সিঁধেল ও ছিচকে চুরি, ছোট খাটো ডাকাতি, গাছ থেকে কলা, পেঁপে , ডাব, নারিকেল, সুপারি এবং হাঁস মুরগী চুরি করা– এসব ছিল প্রতিদিনের ঘটনা। জনসাধারণ ক্ষেতের ফসল এবং সহায় সম্বল রক্ষার জন্য দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকত। প্রতিদিন এরকম অসংখ্য অভিযোগ আসতো চেয়ারম্যান মেম্বরদের কাছে। এ সমস্ত অভিযোগের অনেকগুলোই ফৌজদারী মামলায় রূপান্তরিত হতো। জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ে চেয়ারম্যান, মেম্বরগণ এসমস্ত বিষয়ে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতেন না। এই অরাজক অবস্থা ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে এতোটাই প্রকট ছিল যে জনসাধারণ এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করতো। এধরনের একটি নেতিবাচক ও অরাজক অবস্থাকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করেন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তিনি জনগণের হাতাশাকে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনা ও ঐক্যে

রূপান্তরিত করেন। এলাকার জনসাধারণকে সংগঠিত করার মাধ্যমে প্রথম উদ্যোগ হিসেবে চালু হয় স্বেচ্ছাভিত্তিক নৈশ পাহারা। এতে এলাকায় চুরিডাকাতি প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। অর্জিত এই সাফল্য এবং ঐক্য আরো সংহত হয় গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠনের মাধ্যমে। গ্রাম উন্নয়ন কমিটি এই পর্যায়ে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করে। গ্রামের বেকার যুবক, দীনমজুর, দরিদ্র ব্যক্তি, স্কুল কলেজগামী ছেলেরা রাস্তার ঢাল আগাছামুক্ত করে সেখানে কলার চারা লাগায় । এ সম্পর্কিত প্রথম সফল পরীক্ষা চালিয়েছিলেন এলাকার এক শিক্ষিত যুবক, সাব্বির। তার উদ্যোগের সফলতায় উৎসাহী হয়ে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি এই উদ্যোগটিকে তাদের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে। সিদ্ধান্ত হয় কলাগাছের ফাঁকে ফাঁকে কাঠালের চারা রোপণ করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এই কাঁঠাল গাছ ইউনিয়ন পরিষদের স্থানীয় সম্পদ এবং নগদ অর্থ যোগানদাতায় রূপান্তরিত হবে। আরও সিদ্ধান্ত হয়, কাঠাল গাছ বড় হলে কলাগাছের মত নামমাত্র করের বিনিময়ে চাষীদের কাছেই বৎসর ভিত্তিতে ইজারা দেয়া হবে। এতে খাদ্য ঘাটতি পূরণ এবং স্থানীয় তহবিল গঠন দুইই সম্ভব হবে। পরিবেশ রক্ষায় ফলবান বৃক্ষরোপণের এই উদ্যোগ 'পরিবেশ উন্নয়ন আন্দোলনে' অর্থ উপার্জনকারী একটি নতুন মাত্রা সংযোজনের ইঙ্গিতবাহী।

৫.৩ নৈশ পাহারা ঃ ধীরে ধীরে অধিকতর সংগঠিত ও নতুন উদ্যোগে শুরু হয় নৈশ পাহারা । পাহারার সুবিধার্থে ইউনিয়নকে ৩০টি ভাগে ভাগ করা হয়। এভাবে ৮০ থেকে ১০০টি পরিবারের বসবাসস্থলকে নিয়ে একটি পাহারা এলাকা গড়ে ওঠে এবং একেকটি এলাকায় একেকটি গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গড়ে তোলা হয়। রাস্তার পাশে প্রতি দুটি কলার চারার মাঝখানে একটি করে কাঁঠালের চারা রোপণের কর্মসূচি হাতে নেয়া হয় এবং কলা চাষীদের দায়িত্ব দেয়া হয় এভাবে লাগানো ২৫ হাজার কাঁঠালের চারা রক্ষণাবেক্ষণের। এই কর্মসূচিতে এপর্যায়ে কিছু প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। সিদ্ধান্ত ছিল, রাস্তার পাশে লাগানো কাঠাল গাছ রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে এলাকায় ২ বৎসর কেউ ছাগল পালন করবেনা। কিন্তু অনেকেই ব্যক্তিগত ছাগল বিক্রি করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তবে সামাজিক চাপে বাধ্য হয়ে এদের অধিকাংশ ছাগল বিক্রি করে দেয়। ২/১ জন শেষ পর্যন্ত ছাগল বিক্রি করতে রাজী হয়নি। এনিয়ে গ্রামে ছোট খাট কোন্দল এবং দ্বন্দ্বও সৃষ্টি হয়েছে। তবে এর সংখ্যা ইউনিয়নে খুব বেশী নয়।

৫.৪ কর্মসূচির দ্বিতীয় পার্যায় ঃ প্রকৃতপক্ষে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন, ভিটাবাড়িয়াতে স্বতস্ফূর্তভাবে যে উদ্যোগের গোড়াপত্তন হয়েছিল, সেই কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেব স্থানীয় সমস্যার সমাধানকল্পে বাস্তবানুগ ও

সৃজনশীল সমাধান নিয়ে গ্রামবাসীর সামনে হাজির হলেন। ইউনিয়নে প্রায় একুশ হাজার লোকের বাস এবং মোট পরিবার সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার। কিন্তু ইউনিয়নে মোট গ্রাম মাত্র ৪টি এবং মোট ওয়ার্ড ৩টি । ওয়ার্ড ভিত্তিক বা গ্রাম ভিত্তিক যেকোন কর্মসূচি গ্রহণই দুরূহ হয়ে পড়ে এই ইউনিয়নে। গড়ে প্রতিটি গ্রামের জনসংখ্যা সাড়ে পাঁচ হাজার আর ওয়ার্ড প্রতি জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে সাত হাজার । এককেটি ওয়ার্ডে নির্বাচিত ইউপি মেম্বরদের সংখ্যা মাত্র ৩ জন । সকল গ্রামের আয়তন এবং লোক সংখ্যাও সমান নয়। পাহারার ক্ষেত্রে একই সমস্যা দেখা দেয়। চিন্তা ভাবনা করে প্রতিটি ক্ষেত্রে ৮০ থেকে ১০০ টি পরিবারকে নিয়ে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (গ্রাউক) গঠন করা এবং পুরো ইউনিয়নকে ৩০টি এলাকায় ভাগ করে পাহারা দেওয়া, কলার চারা রোপণ করা, কর আদায়, কাঁঠালের চারার পরিচর্যাসহ কার্যকর ভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়, কাঠামোটি এই এলাকায় 'গ্রাম উন্নয়ন কমিটি', বা সংক্ষেপে 'গ্রাউক' নামে পরিচিতি পেয়েছে। এই কাঠামোর কাজের সাথে আরও কর্মসুচি যোগ হয় ধীরে ধীরে, জোয়ারের লোনা পানি এসে বর্ষা মৌসুমে ফসলের ক্ষতি করছে, যৌথভাবে মৌসুমী খালে বাঁধ দিতে হবে- গ্রাম উন্নয়ন কমিটি উদ্যোগ নিক। জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য দীর্ঘ খাল খনন করতে হবে, ৩০টি গ্রাউক থেকে স্বেচ্ছা সেবক পাঠানো হোক। এভাবেই পিরোজপুর জেলার মধ্যে প্রকৃত স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে প্রথম স্থান অধিকারকারী 'তুলাতলা' খালটি ভিটাবাড়িয়ায় খনন করা সম্ভব হয়েছিল। রাষ্ট্রপতির পুরস্কারের জন্যও খননকৃত এই খালটি মনোনীত হয়।

৫.৫ গ্রাউকের সম্প্রসারিত উদ্যোগ ঃ গ্রাম উন্নয়ন কমিটির দায় দায়িত্ব বাড়তে বাড়তে কলার চাষ, কাঁঠালের চারা রক্ষণাবেক্ষণ , নৈশ পাহারা, খাল খনন, এসবের সাথে যুক্ত হয় স্বাস্থ্যসম্মত 'সেনিটারী' পায়খানা প্রতিস্থাপনের কাজ । কারণ এলাকাটি ছিল ডায়রিয়া প্রবণ এলাকা। গ্রাউকের প্রচারণা ও ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে এখন এই ইউনিয়নে প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ বাড়িতে সেনিটারী ল্যাট্রিন প্রতিস্থাপিত হয়েছে। বিস্ময়করভাবে প্রায় ১০০% ক্ষেত্রে ইপিআই টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। গ্রাউক এরপর দায়িত্ব নিয়েছে গণশিক্ষায় সহযোগিতা করার। গ্রাউক পরিকল্পনা করছে নিজ নিজ এলাকায় হাতে গোণা যে, ২/১ জন করে ভিক্ষুক আছে, যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার, যাতে এরপর তাদেরকে আর ভিক্ষা কর্রতে না হয়। ইতোমধ্যে গ্রাউক এবং ইউনিয়ন পরিষদের যৌথ উদ্যোগে ইউনিয়নটিকে ধুমপানমুক্ত ইউনিয়ন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া মৎস্য চাষ, গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষা, আধুনিক চাষাবাদ ইত্যাদিতেও গ্রাউক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে শুরু

করেছে। কিন্তু গ্রাউকের এই ব্যাপক কর্মকান্ড পরিচলনার জন্য অর্থের প্রয়োজন। প্রথমতঃ রাস্তার ঢালের কলা চাষীদের প্রদত্ত অর্থের এক তৃতীয়াংশ গ্রাউকের প্রাথমিক তহবিল গঠনের জন্য প্রদান করার রীতি চালু করা হয়। এরপর সদস্যদের চাঁদা ও অন্যান্য উৎপাদন বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিটি গ্রাউকের জন্য এক লক্ষ টাকার তহবিল গঠনের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষিত হয়। সর্বোপরি ইউনিয়ন পরিষদের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকার একটি তহবিল গঠনেরও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। ইতোমধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে ৩ একর জমির উপর একটি বৃহদাকার নার্সারী গড়ে তোলা হয়েছে, যা থেকে এ বছর ৩০ হাজার ফল ও কাঠের চারা বিনামূল্যে ইউনিয়নবাসীদের মধ্যে বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষিত হয় ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক।

৫.৬ মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ ইউনিয়ন পরিষদের সৃজনশীল এই উদ্যোগসমূহের মধ্যে মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি স্থানীয় উন্নয়নে আরেকটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। এভাবে স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়নের ক্ষেত্রে– (ক) উপযোগী সংগঠন সৃষ্টি, (খ) মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং (গ) সম্পদ সংগ্রহ তথা তহবিল গঠন – এই তিন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা পাওয়ার কঠিন সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে ভিটাবাড়িয়ায়।

৫.৭ 'গ্রাউক' স্থানীয় সরকারের নিম্নতম কাঠামো ঃ ভিটাবাড়িয়া–অভিজ্ঞতার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ইউনিয়ন পরিষদের আওতায় কর্মোপযোগী 'গ্রাউক' কাঠামোর সন্ধান লাভ। দীর্ঘদিন ধরে এবিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। ভিটাবাড়িয়াতে ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে স্থানীয় জনগণ বাস্তব কাজ ও অভিজ্ঞতার আলোকে তা অতি সহজে নিজেদের মতো করে গড়ে নিয়েছেন।

ভিটাবাড়িয়া পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ঃ

১. জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে, গণপ্রতিনিধির নেতৃত্বের এই পদ্ধতির উদ্ভব
২. সবল, বিচক্ষণ ও সৃজনশীল নেতৃত্বের মাধ্যমে এই কর্মসূচির বিকাশ
৩. ইউনিয়ন পরিষদ কাঠামোকে সৃজনশীলভাবে কর্মক্ষম করার নিরীক্ষা
৪. 'গ্রাম উন্নয়ন কমিটি'র ধারণা প্রবর্তন
৫. স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ সংগ্রহের পদ্ধতি উদ্ভাবন
৬. আর্থ সামাজিক কর্মকান্ডের জন্য জনগণের মধ্যে প্রণোদনা সৃষ্টিতে অভূতপূর্ব সাফল্য এবং

৭. ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম উন্নয়ন কমিটির নিজস্ব তহবিল গঠনের প্রয়োজনীয় অথচ সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ।

৫.৮ গ্রাউক কেন ৮০ থেকে ১০০টি পরিবার নিয়ে ?

ইউনিয়ন পরিষদ বর্তমান কাঠামো অনুসারে ৩টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। প্রতি ওয়ার্ডে রয়েছেন ৩ জন করে নির্বাচিত সদস্য। গড়ে যদি একটি ইউনিয়নে ৩০,০০০ লোক বসবাস করে তাহলে একেকটি ওয়ার্ডের লোক সংখ্যা দাঁড়ায় ১০ হাজার। অর্থাৎ ৩ হাজার লোকের জন্য ১ জন ইউপি মেম্বর। স্থানীয় সরকার কাঠামো সংশোধনের জন্য ১৯৯২ সালে গঠিত কমিশনের প্রস্তাবে ইউনিয়নকে ৯টি ওয়ার্ডে ভাগ করে 'এক মেম্বর এক ওয়ার্ড, পদ্ধতি চালু করার সুপারিশ করা হয়েছে।[২] এটা বাস্তবায়িত হলেও বাস্তব অবস্থার কোন কোন হেরফর হবে না। যদি বাড়ি বাড়ি গিয়ে কোন কর্মসূচি একজন ইউপি সদস্যকে বুঝানোর প্রয়োজন পড়ে তাহলে কর্মসূচিটির স্বপক্ষে প্রণোদনা সৃষ্টির জন্য তার প্রয়োজন হবে কমপক্ষে ২ বৎসর। পক্ষান্তরে ৮০/১০০ পরিবার নিয়ে গঠিত গ্রাম উন্নয়ন কমিটি চালু হলে যে কোন উন্নয়ন কর্মসূচির স্বপক্ষে কয়েকদিনের বা ১/২ মাসের প্রচেষ্টায় সফলতা লাভ সম্ভব বলে ভিটাবাড়িয়ার অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে। ইউএনডিপি'র গ্রাম উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতেও কমবেশী ৮০টি পরিবার নিয়ে গ্রাম উন্নয়ন সেল বা কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া বর্তমানে কিশোরগঞ্জ জেলার গ্রামাঞ্চলে কাজ শুরু করেছে।

৫.৯ ক্ষমতা কাঠামোর দ্বন্দ্ব ঃ ওয়ার্ড মেম্বরদের অনেকে নিজেদের ক্ষমতা খর্ব হচেছ এই অজুহাতে গ্রাম উন্নয়ন কমিটির কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন। ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে রাস্তার পাশে কলাগাছ রোপণের বিরোধিতা করছেন জনৈক মেম্বর, কলাগাছের পাতার কষ থেকে পথচারির পোষাকে দাগ ধরে যেতে পারে, কলা চাষে রাস্তার ক্ষতি হতে পারে ইত্যাদি অভিযোগ তুলে। আরেকজন মেম্বর রাস্তায় কাঁঠাল গাছ লাগানোর বিরোধী, তাঁর মতে সরকার রাস্তার পাশে একাশিয়া, চম্বল মেহগনি লাগাতে পরামর্শ দিয়েছে। কাঁঠাল গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ সরকারী আদেশ অমান্য করছে। তিনি তার এলাকার রাস্তায় কলাগাছ এবং কাঁঠাল গাছ রোপণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন। ইউনিয়নের সর্বত্র গরু, মহিষ বেঁধে পালন করার রীতি চালু হলেও একজন মেম্বর তার গরু মহিষ নিজের ইচ্ছা মাফিক ছেড়ে দিয়ে পালন

---

২. তোফায়েল আহমেদ ও আব্দুল কাদের, স্থানীয় সরকারের যুগ সন্ধিক্ষণ কাঠামো কার্যগত পুনর্গঠনের আলোকে কিছু সুপারিশ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা, পৃষ্ঠা ৫৯।

করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। কেউ কেউ ধুমপান নিরোধ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছে। ৩ জন ওয়ার্ড মেম্বর দীর্ঘদিন যাবৎ ইউনিয়ন পরিষদের কোন সভায় যোগ দেননা। এ সমস্ত মেম্বরগণ কোন উন্নয়ন কর্মকান্ডের উদ্যোক্তা হিসেবেও কাজ করেন না, কোন নতুন উদ্যোগে সহায়তাও করেন না। এই বাস্তবতার নিরিখে অন্য আরেকটি বিষয়ও চিন্তা করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে যদি গ্রাউক তার নিজ দায়িত্ব বুঝে নিয়ে কাজ শুরু করে তাহলে, ওয়ার্ড মেম্বরদের ভুমিকা কিছুটা গৌণ হয়ে পড়ে। ইউনিয়ন পরিষদ এবং গ্রাউকের মাঝখানে পড়ে ওয়ার্ড মেম্বরগণ মনে করতে পারেন তাদের অধিকার এর মাধ্যমে খর্ব হচ্ছে। সুতরাং এখান থেকে স্থানীয় সরকার কাঠামো সংশোধন সংক্রান্ত কমিশনের ইউনিয়নের অধীনে ওয়ার্ড এবং গ্রাম সভা একত্রে গঠনের সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫.১০ এই প্রক্রিয়া টিকে থাকবে কি ? ভিটাবাড়িয়ার স্থানীয় প্রেক্ষাপটে এই প্রক্রিয়ার জন্ম হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ রয়েছে। লক্ষ্যণীয় দিক হলো এখানে মূল নেতৃত্বর ভুমিকা অত্যন্ত ব্যাপক । এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব খান মোঃ এনায়েত করিম একজন নিঃসন্তান দেশপ্রেমিক নাগরিক। তিনি উচ্চ শিক্ষিত (বিএ পাশ)। এলাকায় জনসাধারণের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা রয়েছে। তাঁর সৃজনশীল নেতৃত্ব এই কর্মসূচির একটি সবল দিক। দ্বিতীয় সারির কয়েকজন মেধাবী তরুণ অবশ্য ইতোমধ্যে নেতৃত্বের পর্যায়ে উঠে এসেছেন। তবুও তাঁর অবর্তমানে এই কর্মসূচি স্থায়িত্ব পাবে কিনা সে বিষয়ে সংশয়মুক্ত হওয়া কঠিন।

৫.১১ অন্যত্র প্রয়োগযোগ্যতার ক্ষেত্রে করণীয় ঃ পদ্ধতিটি তুলনামূলকভাবে সরল। ফরিদপুর জেলার মধুখালী থানার অন্তর্গত ডুমাইন ইউনিয়নে এই প্রক্রিয়ায় পরীক্ষামূলকভাবে কিছু কাজ শুরু করা হয়েছে। দেখা গেছে স্থানীয় যুব সম্প্রদায় এবং গ্রামবাসী এতে ব্যাপক সাড়া দিয়েছে। এই উদ্যোগকে ধরে রাখার জন্য নেতৃত্ব সৃষ্টি হলে এই পদ্ধতি অন্যত্র কাজ করতে পারে বলে মনে হয়। তবে এই পদ্ধতির সীমবদ্ধতাসমূহ দূর করারও উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। যেমন এই পদ্ধতিতে মহিলাদের কর্মসংস্থান, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির ওপর তেমন কোন গুরুত্বরোপ করা হয়নি। গ্রাম উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে আওতাভূক্ত এলাকার জরিপ সম্পন্ন হয়নি। গ্রাউকের রেকর্ড এবং হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি সন্তোষজনক নয়। পদ্ধতিতে এখনও ব্যক্তি উদ্যোগে প্রযুক্তি নির্ভর ছোট খাট প্রকল্প গ্রহণের মাত্রা যুক্ত হয়নি। উল্লিখিত সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনায় রেখে ভিটাবাড়িয়া কর্মসূচিকে পূর্ণাংগতা দিতে হলে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে নজর দেয়া যেতে পারে।

প্রথমত ঃ বেকার যুবকরা যাতে গ্রামেই কর্মসংস্থান করে নিতে পারে সে বিষয়ে ভাবা দরকার। যাদের কিছু পুঁজি আছে তাদের জন্য ১০/১২ ধরনের কাজের কথা চিন্তা করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত ঃ যাদের পুঁজি নেই তাদের জন্য সমবায়/ সমিতি ইত্যাদি সংঘবদ্ধ উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। নিজেদের শক্তি এবং ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে পুঁজি গঠনের ওপর জোর দেয়া দরকার। প্রথম গ্রুপ কাজ করতে পারে তাদের ব্যক্তিগত পুঁজি এবং উদ্যোগে। দ্বিতীয় গ্রুপের কাজের ক্ষেত্র হতে পারে রাস্তার পাশ, জলাভূমি এবং আরো বিশেষ কিছু ক্ষেত্র। যুব উন্নয়ন কেন্দ্র, পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর মত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ সমস্ত জায়গায় যুবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া যায়। কাদেরকে ট্রেনিং দিলে কাজ হবে সে বিষয়ে তালিকা প্রণয়ন করা যেতে পারে।

তৃতীয়ঃ সম্প্রদায়/ পেশা এবং অর্থনৈতিক সামর্থ্য বিচার করে কিছু উদ্যোগ নেয়া সম্ভব। যেমন জেলেদের সংগঠিত করা, তাদের সমিতি করে দেয়া এবং সমবায়ের ভিত্তিতে তাদেরক দিয়ে মাছের চাষ করানো। তাঁতীদেরকে সংগঠিত করে তাঁতের কাপড় বোনার ওপর জোর দেয়া যায়। এ বিষয়ের গ্রামীণ ব্যাংকের সহায়তা নেয়া যায়। পণ্যের বাজারজাত করণেরও উদ্যোগ নেয়া দরকার। কাজকর্ম যদি ঠিকভাবে শুরু হয় তাহলে অনেকেই কাজ পেতে পারে গ্রামে বসেই। এগুলো বাস্তবায়ন খুবই কঠিন, কিন্তু তারপরও কঠিন কাজটি সংগঠিত করাই প্রয়োজন। মোট কথা গ্রামের সকল স্তরের মানুষের মধ্যেই সার্বিক ও সুষম উন্নয়নের চেতনা জাগিয়ে দেয়া মূল কাজ। ইউনিয়ন পরিষদ যদি এসব কাজের নেতৃত্ব দেয় সেটাই সর্বোত্তম।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার বিষয়টিও খুব জরুরী, বিশেষতঃ গণশিক্ষা, নারী শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। মহিলাদেরকে সংগঠিত করে কিছু কাজের ব্যবস্থা করা যায়। দেশে এবং বিদেশে নকশী কাঁথার চাহিদা এখন খুবই ভাল। তাছাড়া পাটি বোনা, ছোট খাট কুটির শিল্পের জিনিসপত্র তৈরীর কাজ শুরু হতে পারে। বিসিক থেকে পুতুল তৈরীর ওপরও মহিলাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এঁরা আবার গ্রামে গিয়ে শিক্ষা দিয়ে এর প্রসার ঘটাতে পারে। কাপড়ে রং করার কাজও মহিলারা শিখতে পারে।

এসব কিছুরই ভাল বাজার আছে। এদিকে নজর দিলে অনেকেই চাকরীর পেছনে না ঘুরে নিজেরাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।এই উদ্যোগুলো দুই ভাবে হতে পারে। হয়

সংগঠন করে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে এগুলো হবে। নয়ত যারা এগুলোকে ব্যবসায়িক বা কর্মসংস্থানের উপায় হিসেবে নিতে চায় তাঁদের ব্যক্তি অথবা ২ বা ৩ জনের ছোট ছোট গ্রুপের উদ্যোগে করতে হবে। তবে যেভাবেই উদ্যোগ নেয়া হোক না কেন, প্রথমে বিষয়টা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে। মোটিভেশনটা এমন হতে হবে যেন কোনভাবেই এটা গরীব মানুষকে আরো বেশী শোষণের উপায় না হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের দৃষ্টান্ত আছে। গ্রামের স্কুল কলেজের শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা সচেতনভাবে মহিলাদের কাজে নামানোর এই প্রক্রিয়ায় সামিল হতে পারে।

মহিলাদেরকে কিছু কিছু প্রচলিত কাজে সহায়তা করা যেতে পারে। কোন একজন স্বল্প শিক্ষিত তরুণ বেকার ভদ্রলোক বা মহিলা হাঁস মুরগীর টিকাদানকে বা চিকিৎসা করাকে জীবিকা হিসেবে নিতে পারে। কেউ একজন একটা নার্সারী করে সব্জী এবং ফলের চারা বিক্রির ব্যবসা শুরু করতে পারে। কেউ কেউ টাকার বিনিময়ে আধুনিক পদ্ধতিতে জমি চাষ করে দেয়ার ব্যবসা শুরু করতে পারে। যার মাত্র ৩/৪ বিঘা জমি আছে, এ ধরনের লোকের সারা বছর হালের বলদ না পুষে Power tiller দিয়ে জমি চাষ করিয়ে নেয়া লাভজনক। সে বরং ২/৩ টা গাভী পুষলে সারা বছর তার বাড়তি আয় হতে পারে।

৫.১২ উন্নয়নে স্থানীয় উদ্যোগের মূল ভিত্তি ঃ উল্লিখিত বাস্তবতার নিরিখে সীমাবদ্ধতাসমূহ দূর করে এবং ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামো সরলীকরণের মাধ্যমে ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নে প্রদর্শিত এই পদ্ধতি গ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে পথনির্দেশক হয়ে উঠতে পারে। (ক) উন্নয়ন উপযোগী সংগঠন সৃষ্টি (খ) প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সরবারহের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা দক্ষতা উন্নয়ন এবং (গ) সৃজনশীল উদ্যোগের মাধ্যমে সঞ্চয়, পুঁজি গঠন এবং ব্যক্তি, যৌথ ও সামাজিক উদ্যোগে বিনিয়োগ, সামাজিক কল্যাণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে এ ধরনের উদ্যোগের মূল ভিত্তি।

৫. ১৩ স্বেচ্ছাসেবী/ বেসরকারী সংস্থা কি স্থানীয় সরকারের বিকল্প? বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সার্বিক সমন্বিত ও স্বাধীন বিকাশের কথা চিন্তা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এপ্রসংগে বেসরকারী সংস্থাসমূহের উন্নয়ন উদ্যোগের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। দেশে বেসরকারী সংস্থাসমূহ উন্নয়নের অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে বহুল প্রশংসিত। বেসরকারী সংস্থাগুলো যে উন্নয়ন

প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সেটা নিঃসন্দেহে মহৎ, তবে এসমস্ত সংস্থার উদ্যোগের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন একেকটি সংগঠন একেকটি পৃথক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। কোন সংস্থা হয়তঃ স্বাস্থ্য, কেউ গণশিক্ষা, ইত্যাদি পৃথক পৃথক বিষয়ে কাজ করে। এই উদ্যোগ স্থানীয় পর্যায়ে সার্বিক সমন্বিত উদ্যোগের বিকল্প হতে পারেনা। এই উদ্যোগ বেসরকারী বা ব্যক্তিগত খাতে সার্থকভাবে বিনিয়োগকারী সৃষ্টি করতে পারছে বলেও মনে হয় না। দরিদ্র জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের কেবলমাত্র প্রান্তিক উন্নয়নই এ সমস্ত সংস্থার ঋণ দান এবং অন্যান্য কর্মসূচির মাধ্যমে আংশিকভাবে সাধিত হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। এসমস্ত সংস্থার প্রশাসনিক ব্যয়ও অত্যন্ত বেশী বলে অনেকে মনে করেন। অবশ্য এদের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা পরোক্ষভাবে হয়ত জাতি গঠনে অবদান রাখতে পারবে। কিন্তু স্থানীয় সরকারের নেতৃত্বে, স্থানীয় উদ্যোগে, সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কোন বিকল্প আছে বলে মনে হয় না।

৬. সুপারিশ

ভিটাবাড়িয়া কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে দেশের অন্যত্র পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি নির্দিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে স্থানীয় উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

এই পদ্ধতি থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামো নিম্নরূপ ভাবে পরিবর্তন করার বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

ইউনিয়ন পরিষদের প্রস্তাবিত কাঠামো

ক . ইউপি চেয়ারম্যান –	১ জন	সরাসরি ভোটে নির্বাচিত
খ . ইউপি সদস্য –	৩৬ জন	গ্রাউকের সভাপতি, তিনি প্রতি ১০০ পরিবারের ভেতরে থেকে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত/ মনোনীত হবেন এবং (কমপক্ষে মোট সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ সদস্য মহিলা হবেন)
মোট –	৩৭ জন	

গ্রামউন্নয়ন কমিটির কাঠামো

উপদেষ্টা	ঃ	১ জন	(ইউপি চেয়ারম্যান অথবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি)
সভাপতি	ঃ	১ জন	নির্বাচিত/ মনোনীত (ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য)
সম্পাদক	ঃ	১ জন	নির্বাচিত/ মনোনীত
কোষাধ্যক্ষ	ঃ	১ জন	নির্বাচিত/ মনোনীত
সদস্য	ঃ	৫ জন	নির্বাচিত/ মনোনীত অন্ততঃপক্ষে
		২ জন	মহিলা সদস্য থাকবেন)
মোট		৯ জন	

সদস্যদের মধ্যে থেকে ১০ জনকে ইউনিয়নের ১০টি বিশেষ দপ্তরের সমন্বয়ক নিযুক্ত করা যায়।দপ্তর হতে পারে (১) কৃষি (২) শিক্ষা ৩) স্বাস্থ্য (৪)পরিবেশ (৫) সমাজকল্যাণ (৬) শৃঙ্খলা (৭) অর্থনীতি (৮) সংস্কৃতি (৯) অবকাঠামো নির্মাণ (১০) নারী, শিশু ও অনগ্রসরদের অবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি।

পরিবর্তিত কাঠামো দেশের অন্যত্রও উন্নয়ন সহায়ক হিসেবে কাজ করে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য নিরীক্ষাধর্মী গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে।

স্থানীয় পরিষদকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবাধ এবং ব্যাপক স্বাধীনতা প্রদান করা এবং যুগোপযোগী উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য রুরাল সাপোর্ট কর্মসূচি যুগোপযোগী করা এবং অসংগতিপূর্ণ আইনসমূহ চিহ্নিত করে তা সংশোধিত করা যেতে পারে।

দেশে স্থানীয় কাঠামোর আওতায় সার্বিক উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ব্যাপক প্রয়োগিক গবেষেণা পরিচালনা করা এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা ও সুপারিশমালা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭. উপসংহার

দেশের স্থানীয় সরকারের সব চাইতে শক্তিশালী এবং নিম্নতম স্তর ইউনিয়ন পরিষদ যদি নিজ নিজ এলাকার স্বার্থে স্বনির্ভরতা অর্জনের দায়িত্ব পালন করতে পারে তা হলে সমগ্র দেশের উন্নয়ন সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য। এজন্য সম্পদ যোগান দেয়ার প্রসংগ বড় প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে না, ভিটাবাড়িয়ার অভিজ্ঞতা একথা প্রমাণ করে। এ জন্য সহায়ক (সাপোর্ট) কর্মসূচি গ্রহণ হতে পারে জাতীয় সরকারের দায়িত্ব। যুগোপযোগী স্থানীয় সরকার কাঠামো নির্বাচন এবং তার প্রয়োগ এই সহায়ক কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। স্বাধীনভাবে পুরোপুরি স্থানীয় সরকারের

নেতৃত্বে স্থানীয় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সাফল্য অর্জনই হচ্ছে বাঘের সাথে লড়াই করে টিকে থাকা ভিটাবাড়িয়ায় বসবাসরত জনসাধারণের প্রকৃত সাফল্য। এজন্য কর্মপোযোগী একটি নতুন ও আধুনিক কাঠামোও তারা দেশবাসীর জন্য উপহার দিয়েছে। প্রয়োজন এই কর্মসূচি সৃজনশীলভাবে দেশের অন্যত্র প্রয়োগ করা।

বিঃ দ্রঃ প্রবন্ধটি বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের লোক প্রশাসন মডিউলে পাঠ্যবিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. তোফয়েল আহম্মেদ ও আব্দুল কাদের, *'স্থানীয় সরকারের যুগসন্ধিক্ষণঃ কাঠামো কার্যগত পুনর্গঠণের আলেকে কিছু সুপারিশ,'* বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী,কুমিল্লা, ১৯৯৩।

২. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *'গ্রাম উন্নয়ন পরিক্রমা'*, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর, বৈশাখ ১৪০১।

৩. তোফায়েল আহম্মেদ, *সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির পটভূমি নীতি ও কৌশল একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা* , বার্ড, কুমিল্লা, জানুয়ারী ১৯৯৩।

৪. ত্রয়োদশ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের *গ্রাম সমীক্ষা প্রতিবেদনঃ ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন* , বিপিএটিসি,জুলাই ১৯৯৪।

৫. ভান্ডারিয়া থানার বিভিন্ন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও পরামর্শ।

৬. খান এনায়েত করিম, *গ্রাম উন্নয়ন পরিষদের রূপরেখা,* ভান্ডারিয়া পিরোজপুর, ১৯৯৫।

৭. ডাঃ যোবায়দা হান্নান, *স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়নঃ আশার কোটা গ্রাম ও কুমিল্লা ডায়াবেটিক হাসপাতাল,* কুমিল্লা। ১৯৯৫

৮. জাহাঙ্গীর আলম জনি, *তাঁত, গ্রামীণ শিল্পায়ন ও নয়াকৃষির কিছু অভিজ্ঞতা'* টাঙ্গাইল, ১৯৯৫।

৯. তোফয়েল আহম্মেদ, মোস্তফা কামাল ও তৈয়ব আলী ভুঁইয়া , *'উন্নয়ন ও সংহতির জন্যে পরিবার কাঠামোর গণতন্ত্রায়ন,* বার্ড, কুমিল্লা, মে ১৯৯৪।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৌষ ১৪০২

রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার ঃ বাংলাদেশ প্রসংগ

মোহাম্মদ আলী

১.০ ভূমিকা

দুর্দিনে মানুষ আশার বাণী শুনতে চায়। রাষ্ট্রের নিকট মানুষ আইনানুগভাবে শাসিত হওয়ার এবং আত্মবিকাশে আনুকূল্য লাভের আশা রাখে। বর্তমান কালে রাষ্ট্রকে জনগণের স্বার্থরক্ষাকারী বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান হিসেবে করা হয়। প্রতিটি রাষ্ট্রের পরিচয় তার দ্বারা স্বীকৃত অধিকারের মধ্যে নিহিত । এ প্রসংগে Horold J. Laski তার "A Grammar of Politics" গ্রন্থে বলেন Every State is known by the rights it maintains. Our method of judging its character lies above all, in the contribution that it makes to the substance of man's happiness. রাষ্ট্রমাত্রেরই কিছু নীতিমালা থাকে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই নাগরিকগণ কিছু মৌলিক অধিকার ভোগ করে। এইসব নীতিমালা ও অধিকারসমূহ অধিকাংশ রাষ্ট্রেই সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকে। জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও মানবিক মর্যাদা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এইসব অধিকার ও নীতিমালার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি এবং তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এই আলোচনায় রাষ্ট্রীয় মূলনীতি এবং মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে ধারণা দেয়া হয়েছে এবং এগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

২.০ মৌলিক অধিকার কী?

মানুষের প্রকৃতির মধ্যে কতোগুলো সহজাত বৃত্তি রয়েছে। এগুলোর মধ্যে দর্শন, শ্রবণ, কথন ও বিচরণ উল্লেখযোগ্য । এই বৃত্তিগুলো চিরন্তন। মানুষ এগুলো নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। রাষ্ট্র বা অন্যকোন কর্তৃপক্ষ এগুলো সৃষ্টি করেনা। তাই এগুলো কেউ খর্বও করতে পারে না। জন স্টুয়ার্ট মিল মানুষের নিজের দেহ ও মনের ওপর তার অধিকারকে

নিরংকুশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি এগুলোর ওপর কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ সমর্থন করেন নাই। এগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করার অর্থ হলো সৃষ্টির স্বাভাবিক নিয়মকে বাধাগ্রস্ত করা। তাই এই বৃত্তিগুলোর সংরক্ষণ এবং বিকাশ মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকার । এ কারণে এগুলোকে মৌলিক অধিকার বলা হয়। মৌলিক অধিকারের দ্বারা নাগরিকগণ আত্মবিকাশে আনুকূল্য পায় এবং স্বীয় আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অবাধ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকরসমূহের সুস্পষ্ট বিবরণ দেয়া আছে। এর উদ্দেশ্য হলো নাগরিকদের সকল প্রকার নিরাপত্তা ও সমতার নিশ্চয়তা প্রদান এবং পাশাপাশি সুষ্ঠু বাধা-নিষেধের মাধ্যমে তাদেরকে কর্তব্যপরায়ন করে তোলা।

৩.০ মৌলিক অধিকারের ইতিহাস

৩.১ মৌলিক অধিকারসমূহ আজ যে সাংবিধানিক রূপ পরিগ্রহ করেছে তার একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তির আগে মানুষের জীবনধারা প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রত হত। প্রাকৃতিক আইনের নিম্নোক্ত বিধানগুলো মানবধিকারের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে ঃ

ক) কোন ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে শাস্তি দেয়া যাবে না;
খ) একই অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার শাস্তি দেয়া যাবে না ;
গ) ফরিয়াদি কখনো বিচারক হতে পারবে না ।

৩.২ ইংল্যান্ডের ১২১৫ সনের ম্যাগনাকার্টা সনদ হচ্ছে মানব জাতির ইতিহাসে প্রথম সাংবিধানিক দলিল। এতে বলা হয়েছে, কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে জেলে বন্দী রাখা যাবে না অথবা তার উপর কর আরোপ করা যাবে না যদি না এই ব্যবস্থা পিয়ারদের দ্বারা গৃহীত হয়। একই ভাবে ১৬২৮ সনের পিটিশন অব রাইটস এবং ১৬৮৯ সনের বিল অব রাইটসকে মানবাধিকারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

৩.৩ ১৭৭৬ সনের আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা মানব জাতির অধিকার অর্জনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা হিসাবে কাজ করে। এই ঘোষণায় বলা হয়েছে "All men are created equal with inalienable rights to life, liberty and pursuit of hppiness." ১৭৮৯ সালের ফরাসী মানবাধিকার ঘোষণা বৃটিশ ঐতিহ্য ও

অভিজ্ঞতার আলোকে প্রণয়ন করা হয়। এই ঘোষণায় বলা হয় Men are born and remain free and equal in rights.

৩.৪ ১৯৪৫ সালে গৃহীত জাতিসংঘ সনদের প্রস্তাবনায় মৌলিক মানবিক অধিকার, মানব ব্যক্তির মর্যাদা ও মূল্য এবং নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের প্রতি দৃঢ় আস্থা ব্যক্ত করা হয়েছে। সনদের ৫৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সদস্য রাষ্ট্রসমূহ সনদে বর্ণিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের সহযোগিতায় যৌথ ও পৃথক পৃথক কার্যব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিজেরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে।

৩.৫ জাতিসংঘ সনদের আদর্শ –উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে সাধারণ পরিষদে ১৯৪৮ সনের ১০ই ডিসেম্বর 'মানবিক অধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা' গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণাটিকে মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহের একটি গ্রহণযোগ্য তালিকা হিসেবে গণ্য করা হয়।

৩.৬ 'মানবিক অধিকারের ঘোষণার' প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

৪.০ বাংলাদেশ সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ ঃ

বাংলাদেশের সংবিধানে ২৭ থেকে ৪৭ নং অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য মৌলিক অধিকারসমূহ আলোচনা করা হলঃ

১) *আইনের চোখে সমতাঃ* সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান এবং সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী,

২) *ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্যের অবসানঃ* রাষ্ট্র কেবল ধর্ম ,গোষ্ঠী, বর্ণ ,নারী– পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। তবে নারী শিশু এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান করা যাবে।

৩) *সরকারী নিয়োগ লাভের অধিকারঃ* প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিক সমান সুযোগ পাবেন । ধর্ম, বর্ণ, নারী–পুরুষভেদ বা জন্ম স্থানের কারণে কোন প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না। তবে সমাজের অনগ্রসর অংশের সুবিধার্থে

বিশেষ বিধান করা যাবে। কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ উক্ত ধর্মালম্বীদের জন্য সংক্ষণ করা যাবে। এছাড়া কোন কর্মের বিশষ প্রকৃতির জন্য তা নারী বা পুরুষের জন্য নির্ধারণ করা যাবে।

৪) *বিদেশী খেতাব প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণঃ* রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ছাড়া কোন নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট থেকে কোন উপাধি, সম্মান, পুরস্কার, বা ভূষণ গ্রহণ করতে পারবেন না।

৫) *আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার ঃ* বাংলাদেশের সকল নাগরিকের এবং বাংলাদেশে সাময়িকভাবে বসবাসকারী অপরাপর ব্যক্তির আইনের আশ্রয় লাভের এবং আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভের অধিকার থাকবে।

৬) *জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকারঃ* আইনানুযায়ী ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

৭) *গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচঃ* কারণ না জানিয়ে কোন ব্যক্তিকে আটক রাখা যাবে না । আটকৃত ব্যক্তির তার মনোনীত আইনজীবীর দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার থাকবে। আটককৃত ব্যক্তিকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় বাদে) নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করতে হবে। অবশ্য এই বিধি বিদেশী শত্রু কিংবা নিবর্তনমুলক আইনে আটক ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য হবে না।

৮) *জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণঃ* সকল প্রকার জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ । এই বিধান কোন ভাবে লংঘিত হলে তা আইনতঃ দণ্ডনীয় বলে গণ্য হবে।

৯) *সংগঠনের স্বাধীনতা ঃ* সংঘ বা সমিতি গঠনের অধিকার সকল নাগরিকের থাকবে । তবে জনশৃংঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনানুযায়ী এই অধিকার করা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

১০) *চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক–স্বাধীনতাঃ* সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিকের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এছাড়া রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা এবং নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয়ে আইনের

দ্বারা আরোপিত বিধি নিষেধ সাপেক্ষে বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

১১) *পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতাঃ* আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা– নিষেধ সাপেক্ষ যে কোন পেশা বা বৃত্তি বা ব্যবসায় অবলম্বনের অধিকার সকল নাগরিকের থাকবে।

১২) *ধর্মের স্বাধীনতাঃ* আইন, জনশৃংখলা এবং নৈতিকতা সাপেক্ষ যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন এবং প্রচারের অধিকার সকল নাগরিকের রয়েছে। প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের তাদের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার অধিকার রয়েছে,

১৩) *সম্পত্তির অধিকার ঃ* আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা– নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর ও অন্যভাবে বিলি ব্যবস্থা করা অধিকার থাকবে । আইনের মাধ্যমে ব্যতিত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাবে না। আইনের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক গ্রহণ রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখলের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

১৪) *গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণঃ* রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃংখলা, নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের প্রবেশ তল্লাশী ও আটক থেকে নিজ গৃহে নিরাপত্তা লাভের অধিকার থাকবে এবং চিঠিপত্র ও অন্যান্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করার অধিকার থাকবে।

১৫) *বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণঃ* সংঘটনকালে বলবৎ ছিল এইরূপ আইন ভংগ করার অপরাধ ব্যতীত কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না এবং তৎকালে বলবৎ আইনে দণ্ড দেয়া যেত তার অধিক দণ্ড দেয়া যাবে না। একটি অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারীতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাবে না। ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতে দ্রুত এবং প্রকাশ্য বিচার লাভের অধিকারী হবেন।

১৬) *চলাফেরার স্বাধীনতাঃ* জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা , এর যেকোন স্থানে বসবাস ও

বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ এবং যে কোন সময়ে বাংলাদেশে পুনঃ প্রবেশের অধিকার সকল নাগরিকের থাকবে।

১৭) *সমাবেশের স্বাধীনতাঃ* জনশৃংখলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হওয়ার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণের অধিকার সকল নাগরিকের থাকবে।

৫.০ মৌলিক অধিকারের বাস্তবায়ন ঃ

অন্যান্য সংবিধানের ন্যায় বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৪নং অনুচ্ছেদে সুপ্রীম কোর্টকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যাতে সংবিধানে উল্লিখিত সকল ধরনের অধিকার বলবৎ করা যায়। শ্রীলংকার সংবিধানে ১৭ নং অনুচ্ছেদে, ভারতীয় সংবিধানে ৩২ নং অনুচ্ছেদে, পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের সংবিধানে ২২নং অনুচ্ছেদে, ১৯৬২ সালের সংবিধানে ৯৮ নং অনুচ্ছেদের সংশোধিনীতে এই অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

কেবলমাত্র শ্রীলংকার সংবিধান ব্যতিত উল্লিখিত সকল সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহের প্রাধান্য বিশেষভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে।বাংলাদেশের সংবিধানের ২৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

(১) এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসামঞ্জস্য সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ এই সংবিধান - প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

(২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সাথে অসামঞ্জস্য কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না। এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

৬. ০ রাষ্ট্রীয় মূলনীতির স্বরূপ ঃ

অধিকারের ভিত্তি প্রসংগে হ্যারলড লাস্কি বলেছেন, ব্যক্তির অধিকারের ভিত্তি হলো ব্যক্তি একটি সার্বজনীন লক্ষ্য পূরণের প্রচেষ্টার অংশীদার। এই সার্বজনীন লক্ষ্যটি কী? লক্ষটি হলো জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এবং সুখী সমৃদ্ধ সমাজ গঠন।আধুনিক কালে

প্রতিটি রাষ্ট্রেই নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়নকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার দুটো ভিন্ন বিষয়। মৌলিক অধিকার হলো নাগরিকদের ন্যূনতম চাহিদা যা ছাড়া একজন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক জীবনধারণ সম্ভব নয়। আর মূলনীতি হলো কল্যাণধর্মী সমাজ গঠনের অংগীকার। যেমন, চলাফেরার স্বাধীনতা, পেশার স্বাধীনতা, বাক স্বধীনতা ইত্যাদি হলো মৌলিক অধিকার। আর সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা,সকল প্রকার শোষণের অবসান, জনগণের সকল প্রকার চাহিদা পূরণ, পল্লী উন্নয়ন ইত্যাদি হলো রাষ্ট্রীয় মূলনীতি।

মৌলিক অধিকারসমূহ আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য নয়। এর অর্থ এই নয় যে মূলনীতিগুলো তাৎপর্যহীন। বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত মূলনীতিসমূহ নিম্নোক্ত চারটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

ক) বাংলাদেশ পরিচালনার মুলসূত্র হিসেবে,
খ) আইণ প্রণয়নের নির্দেশক হিসেবে,
গ) সংবিধান ও আইন ব্যাখ্যার নির্দেশক হিসেবে এবং
ঘ) রাষ্ট্র ও নাগরিকের কার্যের ভিত্তি হিসেবে।

৭.০ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিঃ

বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয়ভাগে ১৬টি অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রীয় মুলনীতিসমূহ বিবৃত করা হয়েছে। বিষয়বস্তু হিসেবে এই মূলনীতিগুলো কার্যতঃ এই উপমহাদেশের অপর দু' টো দেশ ভারত ও পাকিস্তানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ভারতীয় সংবিধানে মুলনীতিগুলোকে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নিদের্শক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে । সেখানে মৌলিক অধিকার সমূহকেও একইভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাকিস্তানের ১৯৬২ সালের সংবিধানে " মৌলিক অধিকারসমূহ এবং মূলনীতি " হিসেবে একটি একক অধ্যায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে প্রথমতঃ জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতাকে মুলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিলো। পরবর্তী পর্যায়ে সমাজতন্ত্রর পরিবর্তে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার এবং ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস কে মূলনীতি করা হয়েছে। এছাড়া বাংগালী জাতীয়তার পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তাকে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

উপরে বর্ণিত প্রধান মূলনীতিগুলো ছাড়া আরো যেসব বিষয় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

১) *স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন ঃ* রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট্য এলাকার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দেবে। এই সকল প্রতিষ্ঠানে কৃষক শ্রমিক ও মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করবে।

২) *জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণঃ* রাষ্ট্র জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করবে।

৩) *মালিকানার নীতি ঃ* রাষ্ট্রে সম্পত্তির তিন প্রকার মালিকানা থাকবে। যেমন- রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায় মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানা।

৪) *কৃষক শ্রমিকের মুক্তিঃ* রাষ্ট্র সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর লোকদের অর্থাৎ শ্রমিক ও কৃষকদের সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৫) *জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থাগ্রহণঃ* রাষ্ট্র পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের উন্নয়ন সাধন করবে, যার দ্বারা অন্ন বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা, যুক্তিসংগত মজুরী, যুক্তিসংগত বিশ্রাম ও বিনোদনের অধিকার এবং আয়াত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করা যায়।

৬) *গ্রামীণ জনগণের জীবনমান উন্নয়নঃ* রাষ্ট্র গ্রামীণ জনগণের জীবন যাত্রার মনোন্নয়ন করবে। পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুতায়ন, শিল্পের প্রসার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যবস্থা নিবে।

৭) *অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ঃ* রাষ্ট্র জনগণের জন্য একটি সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করবে এবং একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নিবে।

৮) *জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতার উন্নয়নঃ* জনগণের পুষ্টির উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধানকে রাষ্ট্র তার অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে গণ্য করবে। আরোগ্যের প্রয়োজন ব্যতীত মাদকদ্রব্য গ্রহণ ও স্বাস্থ্য হানিকর ভেষজের ব্যবহার বন্ধ করবে। এছাড়া রাষ্ট্র গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯) *সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ ঃ* সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে। এছাড়া মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০) *নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্যঃ* সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা করা, নাগরিক দায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা সকল নাগরিকের কর্তব্য । এছাড়া সকল সময়ে জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য ।

১১) *অধিকার ও কর্তব্যরূপ কর্মঃ* কর্ম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয় । রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের কর্মানুযায়ী পারিশ্রমিক লাভ নিশ্চিত করবে এবং অনুপার্জিত আয় ভোগ রহিত করবে।

১২) *বিচার বিভাগের পৃথকীকরণঃ* রাষ্ট্র নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ নিশ্চিত করবে।

১৩) *জাতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও উন্নয়নঃ* রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সংরক্ষণ এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলার পরিপোষণ ও উন্নয়নের লক্ষে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৪) *জাতীয় স্মৃতি-নিদর্শন প্রভৃতি সংরক্ষণঃ* বিশেষ শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন স্মৃতি নিদর্শন, বস্তু বা স্থানসমূহকে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ থেকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৫) *আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়নঃ* জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট থাকবে।

৮.০ পর্যালোচনাঃ

বাংলাদেশর সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আইনের চোখে সমতা, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের সমানাধিকার, বেআইনীভাবে গ্রেফতার না হওয়ার এবং আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার ,শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশের অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার এবং যে কোন ধর্মমত পোষন ও প্রচারের অধিকার। এছাড়া গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আদালতের সামনে হাজির করা এবং বিনাবিচারে দণ্ড না দেয়ার কথাও সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে। এসব অধিকার লংঘিত হলে আদালতের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করা যায়। বাংলাদেশে বেআইনী গ্রেফতারের বিরুদ্ধে একাধিক 'রীট' মামলাও হয়েছে। অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য অপরিসীম । তবে রীট মামলা করার সামর্থ্য সকলের থাকে না। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধিকার লংঘনের ঘটনা প্রতিকারবিহীন থেকে যায়। এছাড়া অন্যান্য অধিকারসমূহ যেমন সমাবেশের অধিকার, মতপ্রকাশের অধিকার এবং ধর্মপালনের অধিকার জনগণ মোটামুটি ভোগ করতে পারছে। তবে প্রায়শঃই থানায় আটক ব্যক্তির ওপর নির্যাতন এবং বিনাবিচারে কারাভোগের খবর পাওয়া যায়। এগুলো নিঃসন্দেহে মৌলিক অধিকরের চরম লংঘণ।

বাংলাদেশ সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহের মধ্যে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ, কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি ,জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতার উন্নয়ন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহ যদিও আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়, তথাপি সংবিধানে এগুলোকে বাংলাদেশ পরিচালনার মূলসূত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং জনগণের মানবিক মর্যাদা নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধাসমূহ সাধারণ মানুষের আওতার অধীনে রাখার ব্যাপারে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা অনস্বীকার্য। এছাড়া সংবিধানে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের যে অংগীকার ব্যক্ত করা হয়েছে তারও বাস্তবায়ন প্রয়োজন । এ প্রসংগে আরেকটি কথা বলা প্রয়োজন, বাংলাদেশের অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি গণতন্ত্রের ভবিষ্যত সমন্ধে অনেককেই সংশয় প্রকাশ করতে দেখা যায়। এ ব্যাপারে হতাশ হওয়ার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। কারণ গণতন্ত্রের যাত্রাপথ কখনোই কন্টকমুক্ত নয়। এ বিষয়ে এ,ডি. লিন্ডসের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেছেন, Democracy is never complete it ever grows into being. গণতন্ত্র কখনোই পূর্ণ নয়। এটি ক্রমশঃ বিকশিত হয়। গণতন্ত্র ও মানবিক অধিকারের জন্য জনগণের আকাংখা জাগ্রত রয়েছে। এর তাৎপর্য অপরিসীম।

৯.০ উপসংহার ঃ

একটি জাতির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এবং বিপুল আত্মত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনায় যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিলো সে সকল আদর্শ সমুন্নত রাখার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেক নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করার অংগীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সংবিধানের ৭ম অনুচ্ছেদ জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি হিসেবে সাংবিধানকে প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং সংবিধানে নাগরিকদের যেসব অধিকর প্রদান করা হয়েছে তা যেমন নিশ্চিত করতে হবে তেমনি সংবিধানে যেসব অংগীকার করা হয়েছে তাও বিস্মৃত হওয়া চলবে না।

বিঃ দ্রঃ প্রবন্ধটি বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের বাংলাদেশ চর্চা মডিউলে পাঠ্য বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,* ঢাকা ১০ অক্টোবর, ১৯৯১ইং (পৃঃ-২, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬, ১৮, ২০, ২২, ২৪, ২৬, ২৮, ৩০ ও ৩২)

২। Harol J. Laski *A Grammar of Politics*. Geroge Allen Unwin Ltd. London, Fifth edition 1967 (P. 89, 91, 94)

৩। John C. Fees, *John Stuart Mill's on liberty* Clarendon Press, Oxford. 1995 (P.138, 139)

৪। A. D. Lindsay. *Essentials of Democracy* Clarendon Press. Oxford, second edition (sixth impressim) 1967.

৫। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, *আজকের জাতিসংঘ,* ঢাকা, জানুয়ারী ১৯৮৭, (পৃঃ- ১০ ও ১৩২)।

৬। গাজী শামছুর রহমান, *বাংলাদেশ সংবিধান,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬ (পৃঃ- ১০, ১১, ও ১২)।

৭। মওদুদ আহমেদ, *বাংলাদেশ, শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল,* ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৭ (পৃঃ- ১২৩, ১২৪ ও ১২৫)।

৮। আবুল ফজল হক, *আন্তর্জাতিক আইনের মূল দলিল,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে-১৯৮৬, (পৃঃ- ৭, ৩২, ৩৩ ও ৩১৩)।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৌষ ১৪০২

দেওয়ানী কার্যবিধির রূপরেখা

মোঃ হাসিবুর রহমান

১. ভূমিকা

"সিভিল প্রসিজিউরস্ কোড" এর এব্রিবিয়েশন হচ্ছে সিপিসি। ফৌজদারী কার্যধারার মত এটিও কোন কোন ক্ষেত্রে Substantive Law এবং কোন কোন ক্ষেত্রে Procedural Law বা Adjective law হিসাবে কাজ করে। এই দুটি ভাগ উদ্দেশ্য (Aim) এবং উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার উপায়ের (Means) উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত। দণ্ডবিধি সবটাই Substantive law বা অপরাধীকে শাস্তি দেবার আইন। দণ্ডবিধি বলে দেয়, এই অপরাধের এই শাস্তি । কিন্তু ফৌজদারী কার্যধারা বলে দেয় আসামীকে কিভাবে হাজির করতে হবে, কিভাবে অপরাধ প্রমাণের জন্য সাক্ষী দরকার হবে, তদন্ত করতে হবে ইত্যাদি, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যধারা substantive law হিসাবে কাজ করে। যেমন, শান্তিরক্ষার জন্য ১০৭ ধারা, ধ্বংসাত্মক জনতা ছত্রভঙ্গ করার জন্য ১৪৪ ধারা, উৎপাৎ দূর করণের জন্য ১৩৩ ধারা ইত্যাদি।ফৌজদারী কার্যধারা ও দণ্ডবিধিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেই, কিন্তু দেওয়ানী কার্যধারাতে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আছে। Aggrieved persons বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদালতকে তার grievances বা অধিকার ক্ষুণ্ন হবার বিষয় মামলা বা plaint বা case আকারে জানাবে এটিই আরজি, যাকে ইংরেজীতে বলা যায় "Bundle of facts placed before a Court".দেওয়ানী কার্যধারাতেও বাদী পক্ষের আরজির পর বিবাদী পক্ষকেও তার রেজিষ্ট্রীকৃত দলিলপত্র, সাক্ষ্য প্রমাণ ইত্যাদি সহ হাজির হবার জন্য সমন দেয়া হয়ে থাকে। বাদী বিবাদীর সাক্ষ্য গ্রহণ ও জেরা এবং শুনানীর পর রায় এবং সর্বশেষ ডিক্রী জারী হয়ে থাকে। দুই পক্ষের উপস্থিতিতেই ডিক্রী বা চূড়ান্ত রায় প্রদান করা হয়। Mis-case এর রায় অনেক সময় একপক্ষ হাজির থাকলেও হয়, যেমন ভুল নামজারী সংশোধনের ক্ষেত্রে । কিভাবে সম্পত্তি বা অধিকার নিয়ে মোকদ্দমা করতে হয় আরজি পেশ করার মাধ্যমে তা বিস্তারিত ভাবে নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

২. দেওয়ানী মামলা রুজু করার পদ্ধতি

দেওয়ানী আদালত বা জজ কোর্টে আছেন সেরেস্তাদার, যার নিকট মাম্‌লা প্রথম রুজু করতে হয়ে আরজি পেশ করার মাধ্যমে। সেশন জজ এবং দায়রা জজ একই ব্যক্তি। যখন সিপিসি Substantive Law হিসাবে কাজ করে তখন উপযুক্ত Procedures বা নিয়ম পদ্ধতি নিয়ে কাজ করে, বিশেষ বিশেষ দেওয়ানী আইন নিয়ে কাজ করে। যেমন জমির রেজিষ্ট্রেশন আইন, সম্পত্তি হস্তান্তর আইন নিষেধাজ্ঞা বা Injunction জারী (স্থায়ী ও অস্থায়ী) Interlocking বা রিসিভার নিয়োগ, অগ্রিম ক্রোক (Attachment before judgement) ইত্যাদি। দেওয়ানী মামলায় বাদীকে বলা হয় Plaintiff এবং বিবাদীকে বলা হয় Defendent কিন্তু ফৌজদারীতে বাদীকে বলা হয় Conplainant এবং বিবাদীকে বলা হয় Accused.

৩. দেওয়ানী মামলা পরিচালনার প্রক্রিয়া

দেওয়ানী মামলা পরিচালনার প্রয়োজন, দেওয়ানী মামলাতেও সাক্ষী সাবুদ লাগে। তাই সাক্ষ্য আইন এখানেও প্রযোজ্য। শুধু সাক্ষ্য আইনই নয়, আরজি দাঁড় করাতে কতিপয় ধারা সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে, তবেই আরজি দাঁড় করানোটা সঠিক হবে এবং আরজি দাঁড় করাবার পর Civil Procedures Code এর ধাপে ধাপে ধীরে অগ্রসর হওয়া যাবে। ঐ ধারাগুলি নিম্নলিখিত আইন সম্পর্কে (১) Limitation Act বা তামাদি আইন । অর্থাৎ মামলা করার মেয়াদ আছে কিনা, কোন কোন অধিকার ক্ষুণ্ন হবার ১৫ দিন, ৩০ দিন , ৪ মাস, ৩ মাস, ৬ মাস, ,৬বছর, ১২বছর পর্যন্ত তা' আদায়ের মেয়াদ থাকে আদালতে দরখাস্ত বা আরজি পেশ করার । ঐ মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে আরজি আদালত কর্তৃক প্রথমেই ফেরৎ দেয়া হয়, অথবা মামলা চলাকালে এটি দেখিয়ে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে তামাদি আইনে বিমুখ করা হয় । তাই আগেই জেনে নিতে হয় আরজি পেশ করার মেয়াদ আছে কিনা (২) সাক্ষী সাবুদ এবং রেজিষ্টীকৃত দলিলপত্র বা প্রমাণের জন্য মৌখিক সাক্ষ্য বা দলিলী সাক্ষ্য আছে কিনা তা আগেই দেখতে হবে। (৩) টাকা ব্যতীত মামলা হয়না । তাই কোর্ট ফি আছে কিনা এবং সম্পত্তির বাজার দর অনুযায়ী তা আরজির সাথে দেওয়া হয়েছে কিনা তাও সর্বাগ্রে দেখে নিতে হবে এবং কোর্ট ফি সংক্রান্ত আইনও জানা থাকতে হবে কত টাকা মূল্যের সম্পত্তির জন্য কত কোর্ট ফি এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি এবং তা প্রদানের নিয়ম কানুন। (৪) সম্পত্তির বাজার

মূল্য জেনে নিতে হবে। আইন সংগত পদ্ধতিতে ১ বছরের বিক্রীত জমির বাজার দর (৫) কত টাকার সম্পত্তি কোন্ কোর্টে যাবে তাও জেনে মোকদ্দমা যার, তার আপীল করতে হবে এবং এটাই Specuniary jurisdiction সহকারী জজ, সিনিয়র সহকারী জজ, সাব জজ, অতিরিক্ত জজ, জেলা জজ বিভিন্ন পরিমাণ টাকার মামলা নিতে পারেন বা মামলার আপীল গ্রহণ করতে পারেন। এখানে ভুল হলেও মামলার রায় অকার্যকর হয়ে যেতে পারে। Territorial jurisdiction, subject jurisdiction ও দেখতে হবে, এগুলোতে ভুলের জন্যও আপীলে রায় ভুল বলে বিবেচিত হয়ে যেতে পারে ।

৪. দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থার কাঠামো

সহকারী জজ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত মোকদ্দমার বিচার নিষ্পণ্ন করতে পারেন। ৫০,০০১ হতে ১ (এক) লাখ টাকার উর্দ্ধের টাকার সমস্ত মামলা নিষ্পণ্ন হয় সাব জজ আদালতে। দেওয়ানী কর্যবিধির ১৫ ধারার কোড মোতাবেক প্রত্যেকটি মোকদ্দমা যোগ্যতা সম্পন্ন সর্বনিম্নপর্যায়ের আদালতে দায়ের করতে হবে। সহকারী জজের সকল ডিক্রী বা আদেশ হতেই জেলা জজ আদালতে আপীল চলবে, তবে তিনি ঐ কাজ অতিরিক্ত জেলা জজকে বা সাব জজ দিয়েও করাতে পারেন। একজন সহকারী জজ শুধুমাত্র একটি থানাতেই এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারেন, তবে সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাকে অন্য থানাতেও সার্কিট ডিউটি পালনের ক্ষমতা দিতে পারেন। সহকারী জজ সিনিয়র 'পাওয়ার' পাওয়ার পরে একাধিক থানায় দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

৫. দেওয়ানী মোকদ্দমার বিষয়

মোকদ্দমার বিষয়বস্তুর মূল্যমান সম্পর্কে আদালতের এখতিয়ারের এই সীমাবদ্ধতাকে আদালত সমূহের আর্থিক এখতিয়ার বলা হয়। কোন নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত অথবা কোন চুক্তির সুনির্দিষ্ট সম্পাদন সম্পর্কে কোন মোকদ্দমা স্বল্প এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে (Small Causes Court) দায়ের করা চলবে না। বিবাহ, তালাক, দাম্পত্য অধিকার প্রত্যর্পন ইত্যাদি বিষয়ক মোকদ্দমা পারিবারিক আদালত ব্যতীত দায়ের করা চলবে না। শিল্প বিরোধ সম্পর্কিত মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে দায়ের করা চলবে না। এই সমুদয়কে আদালতের বিষয়স্তু সম্পর্কিত এখতিয়ার বলা হয়। প্রত্যেক আদালত, সরকার কর্তৃক সময় সময় গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষিত স্থানীয় অধিক্ষেত্রের বাইরের মোকদ্দমার বিচার করবেন না।

৬. দেওয়ানী কার্যবিধির প্রধান প্রধান দিক

দেওয়ানী কার্যবিধিতে অস্থায়ী ইনজাংশনের ব্যবস্থা আছে। এটি যে কোন পক্ষের দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে হয়। রিলিফ কোডে স্থায়ী ইনজাংশনের ব্যবস্থা আছে। ডিক্রী জারীর পরে ম্যানডেটরী ইনজাংশন হয়। রায়ের পরেই ডিক্রী জারী করা হয়। ডিক্রী Conclusive সিদ্ধান্ত যখন দুই পক্ষই উপস্থিত থাকে। মিস্ কেসের সময় মাত্র এক পক্ষও উপস্থিত থাকতে পারে।

৭. অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা

অস্থায়ী ইনজাংশন বাদী বা বিবাদী যেকোন পক্ষ দরখাস্ত করে জারী করাতে পারে (জেলা জজ আদালতে বা হাইকোর্টে দরখাস্ত করে)। এটি মামলা চলাকালে জারী করানো হয়। কোন পক্ষ যদি প্রমাণ করাতে পারে যে, সম্পত্তিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা না করালে এমন ঘটনা ঘটবে যে তা পরে টাকায় সারবে না যেমন–জানমাল ও ইজ্জতের ক্ষতি (বিবাহ শাদীর ক্ষেত্রে ইজ্জতের ক্ষতি) মামলার চূড়ান্ত রায় বা ডিক্রী পর্যন্ত সময়ের জন্য তাই সম্পত্তিতে Injunction বা নিষেধাজ্ঞা জারী করাতে হয়। স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মামলার সময় ছাড়াও হয়। যেমন, কোন উঁচু দালান নির্মাণের জন্য কারো বাড়ীর আলো বাতাস বন্ধ হয়ে গেলে। তখন নতুন মামলা টর্ট আইনে নিষ্পন্ন হয়ে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী হয়ে ঐ নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে যায়। চুক্তি আইনে চুক্তির পর এটি ভংগের জন্য সংক্ষুব্ধ পক্ষের অধিকার ক্ষুণ্ন হলে তার রায় দেওয়ানী আইনে প্রদান করা হয়। চুক্তি হয়নি, তবু দেওয়ানী ক্ষতি হলে টর্ট আইনে যেতে হয়। রেজিষ্ট্রেশন আইন বলে দেয় কোন্ কোন্ দলিল পত্র রেজিষ্ট্রি করতে হবে। মুসলমানদের বিবাহ এক ধরনের চুক্তি। মোহরানার বদলে নিক্বাহ পড়ানো হয়। তাই মুসলমানের বিবাহ চুক্তি আইনে পড়ে। অন্যান্য চুক্তি রেজিষ্ট্রি দরকার না হলেও বাংলাদেশের বিবাহ দলিল বা কাবিন রেজিষ্ট্রেশন ব্যতীত বেআইনী। জমি জমা কথা বলতে পারে না, কিন্তু মানুষ কথা বলতে পারে। তাই স্বাধীনতা যুদ্ধে বা অন্য কোন ভাবে রেজিষ্ট্রীকৃত কাবিন নষ্ট হয়ে গেলে স্ত্রী বা স্বামী সেই ঘটনা সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য দিতে পারবে, সন্তান-সন্ততিরাও সাক্ষ্য দিয়ে বলতে পারবে কে তাদের পিতামাতা। তবে রেজিষ্ট্রীকৃত কাবিন বা দলিল সংগে থাকা ভাল। মালয়েশিয়াতে এই দলিল না দেখানো বাধ্যতামূলক।

৮. জমি জমার হস্তান্তরে দেওয়ানী আইন

এটি অনেক ধরনের হতে পারে Sale, Lease, licence বা অনুমতি দখল প্রদান, বন্ধক, হেবা বা উইল, বেল এওয়াজ হেবা, এওয়াজ বদল, দান ইত্যাদি। Sale এর সংজ্ঞা ডঃ রফিকুর রহমানের মতে "যে হস্তান্তরের দ্বারা কারো অধিকার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ও কারো অধিকার সৃষ্টি হয়।" এই সংজ্ঞাতেই দেখতে হবে বিক্রয়টি ঠিক হয়েছে, না জাল। রেজিষ্ট্রি আইনের ১৭ ধারাতে লম্বা ফিরিস্তি আছে কোন কোন হস্তান্তর রেজিষ্ট্রি করতে হবে। বাড়ী ভাড়া দেওয়া ও "Lease" রেজিষ্ট্রেশন লাগেনা। এইগুলি সম্পূর্ণ অস্থায়ী এবং অল্প দিনের জন্য বলে। আমলনামা রেজিষ্ট্রী করতে হয়। জমিদার যখন আমলে নেয় বা প্রজাকে কোন জমিতে আমল দেয় বা দখল ছেড়ে দেয় তখন তাকে আমলনামা বলে। এটি রেজিষ্ট্রী হতে হয়। শের শাহ্‌র আমালের কবুলিয়ত ও পাট্টা, সম্রাট আকবর (টোডরমলের সংস্কার) এবং তারপর অন্যান্য মুঘল সম্রাট এবং ইংরেজ আমলেও প্রচলিত ছিল। পাট্টা জমিদারেরা দিতো প্রজাকে আর প্রজা তা জমিদারদের দেওয়া শর্তে কবুল করে নিলেই তা হতো কবুলিয়ত। জমিদার ছিল খাজনার মালিক এবং প্রজা ছিল জমির মালিক। তবে বিটি এ্যাক্টের (১৮৮৫ সালের রাষ্ট্রীয় প্রজাস্বত্ব আইন) বলে সন্তানেরা ওয়ারিশ হতো। কিন্তু বেঁচতে পারতোনা। ঐ আইনে বড় বড় পুরানো গাছ কাট্‌তে পারতো না, কিন্তু প্রজাকে না দিয়ে জমিদারেরা নিজেরা কেটে নিতো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) ও রেন্ট এ্যাক্ট (১৮৬৯) এর বলে খাজনা নিয়ে রশিদ দেয়া হতো। Floud Commission এর রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৫০ সালে S. A. Act. or Estate Acquisition and Tenancy Act. পাশ হয়। ইংরেজগণ এদেশ হতে বিদায় নেবার পর এবং ১৯৫৫ সালের বিধি মোতাবেক এস, এ, এ্যাক্ট কার্যকর হয়। জমিদারী বাতিল হয় এবং প্রজার স্বত্ব কায়েম হয়। টি, পি, এ্যাক্ট (Transfer of property Act) অনুসারে প্রজারা তাদের জমি হস্তান্তর করতে থাকে বা উত্তরাধিকারিগণ তাদের জমির মালিক হিসাবে ভোগদখল করতে থাকে, বা দান, হেবা, বন্ধক, অনুমতি দখল বা Licence lease ইত্যাদি চলে। উইল রেজিষ্ট্রী করতে হয়না, এমন কি সাদা কাগজে না লিখলে চলে। শুধু মুখে বলে গেলেই হয় এবং ২/৪ জন সাক্ষী থাকলেই হয়। শর্ত থাকে যে ঐ জমির মালিক ঘোষণাকারী নিজে হতে হবে, উহা তার সমস্ত সম্পত্তির ১/৩ কে ছাড়িয়ে যাবে না এবং উহা ঐ জমির ওয়ারিশেরা সবাই মেনে নিবেন। ওয়ারিশেরা মেনে নেবার পরও জজকোর্ট বা দেওয়ানী আদালত হতে ঐ উইল সম্পত্তির মূল্য অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট জজকে দিয়ে সই করিয়ে আনতে হবে, এটাকে বলা হয় Probate. প্রবেট করানোর পর উইলকে স্বীকৃতিদানকারী পুনরায় এটি অস্বীকার করলেও টিকে না, তবে প্রবেট না করালে বন্টননামা বা যে কোন ভাবে

খুশীমত দলিলে রেজিষ্টী করালেও ওয়ারিশগণ ভেটো দিয়ে বাতিল করে দিতে পারেন। প্রবেটের পর তাদের আর ক্ষমতা থাকেনা অস্বীকার করার।

৯. বাড়ী ভাড়া

Transfer of property Act এর ১০৬ ধারায় আছে বাড়ী ওয়ালা ভাড়াটিয়াকে অন্ততঃ ১৫ দিনের নোটিশ না দিয়ে বাড়ী হতে উচ্ছেদ করতে পারবেন না। ১৫ দিন মাসের শেষের দিকে হলে চলবে না। মধ্য মাসে হতে হবে এবং এটি আইনে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও যুক্তি সংগত, কারণ মধ্য মাসে ভাড়াটিয়ার বাড়ী ভাড়া পেতে অসুবিধাও হতে পারে। সুতরাং বাড়ী ছেড়ে দেবার পরও ১৫ দিন সময় ভাড়াটিয়া পাবেন তার সুবিধামত সময়ে অন্য বাড়ীতে ওঠার জন্য। কিন্তু বাড়ী নিয়ে যদি মামলা চলতে থাকে এবং মামলা বেশ কয়েকমাস যাবৎ চলতে থাকে তখন এই ১৫ দিনের সুবিধার কথা উথাপন করা যাবেনা। ১৫ দিন সময় ১০৬ ধারায় দেওয়া আছে যাতে অপ্রস্তুত অবস্থায় বাড়ীওয়ালা ভাড়াটিয়াকে বের করে পথে বসাতে না পারে।

১০. রেজিষ্ট্রেশন

অনুমতি দখল বা Licence অস্থায়ী, এটিও রেজিষ্ট্রেশন করতে হয় না। কিন্তু যে কোন ধরনের বন্ধক বা মর্টগেজ ১৯০৮ সালের রেজিষ্ট্রেশন আইনে রেজিষ্ট্রেশন করাতে হয়।

১১. দান

দানেও রেজিষ্ট্রেশন লাগে না। দানের ক্ষেত্রে (Gift) দানকারীর মৃত্যুর আগে দখলে যেতে হয়, কিন্তু উইলে মৃত্যুর পরে দখলে যাবার মত যথেষ্ট সময় হাতে থাকে। বেল এওয়াজ হেবা কোন তসবিহ্, কুরানশরীফ জায়নামাজ ইত্যাদির যে কোন কিছুর বিনিময়ে করা হয় বলে এটি সাফ কাওলা বিক্রীর সামিল।

১২. জালদলিল

কোন দলিল যদি জাল হয়, তখন ঐ জালিয়াতির ৩ বছরের মধ্যে কোর্টে আসতে হয়। তিন বছরের পরে কোর্টে আসলে তামাদি আইনে এ মামলার আরজি বাতিলও হয়ে যেতে পারে–"দেরীর কৈফিয়ত দিতে না পারলে।

১৩. ঘটনা মূলক মামলা

Declaratory Suit বা ঘটনা মূলক মামলা ৬ বছরের মধ্যে করতে হয় এটি দেওয়ানী কার্যধারা বা সিপিসির ৪২ ধারা। ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ সুখাধিকার পুনরায় ভোগের অধিকার লাভ (জমি ব্যক্তি বিশেষ, পৌরসভা, সরকার ইত্যাদির দখলে যাবার পর) ইত্যাদি বিষয়ের মামলা এই ৪২ ধারায় নিষ্পন্ন হয়।

১৪. বেদখল স্বত্ব

কারো স্বত্ব যদি হঠাৎ বেদখল হয়ে যায় তখন ৬ মাসের মধ্যে মামলা করতে হয়। এটি সেকশন ৬। Specific Relief Act এর আওতায় চুক্তি ভংগের জন্য অধিকার নষ্ট হবার আরজিও ৩ বৎসরের মধ্যে করতে হয়।

১৫. অংশিদারিত্বের সময় সীমা

দেওয়ানী আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের সমস্যা সমূহ বাটোয়ারা মামলার জন্য কোন সময়-সীমা বা তামাদি আইন নেই। বাটোয়ারা মামলা হলো ওয়ারিশগণের হিসসা বাটোয়ারা বা বন্টননামা করে নেওয়া। এই মামলায় আরজি সমস্ত ওয়ারিশান একত্র হয়ে করতে হয়। একজনও অনুপস্থিত থাকলে মামলা চলেনা এবং সমস্ত জমি একত্রে এনে হিসাব করতে হয়। এখানেই সমস্যা। হঠাৎ একজন শরীক মারা গেলে তার ছেলে মেয়েরা কেউ আমেরিকা, কেউ দিনাজপুর, কেউ বান্দরবন, কেউ বরিশাল থাকলে এই ধরনের বাটোয়ারা মামলা করা যায় না। এক মামলা এক জজের নয়, কয়েক জজের আমল ও অংশীদারদের আমল পার হয়ে যায়। তাই আজকাল এই ধরনের মামলা কেউ করেই না। তাই বাটোয়ারা মামলাতেও তামাদির সময় থাকা উচিত। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওয়ারিশগণ সম্পত্তি না নিলে তা এখন যার দখলে আছে সেই ভোগ দখল করতে পারবে। বর্তমানে এই ধরনের সময়সীমার মেয়াদ বাটোয়ারা মামলায় নেই। ফৌজদারী ও বাটোয়ারা মামলার মেয়াদ এখন অসীম সময়- শত শত বছর যাবৎ ও চলতে পারে। তাই অনেকে মামলাতেই যেতে চান না।

১৬. দেওয়ানী কার্যবিধির আরো কতিপয় গুরুত্বপুর্ণধারা

অগ্রক্রয়োধিকার বা Pre-emption বা "হক ছাফা" এখন চারভাবে সম্পন্ন হয়। (১) এস এ এ্যাক্ট ৯৬ অনুসারে (২) Non Agricultural Tenancy Act অনুসারে; সেকশন ২৪ (৩) Undivided partition Act অনুসারে (১) দলিল রেজিষ্ট্রেশনের ৪ মাসের মধ্যে আরজি পেশ করতে হয় (২) অন্যের নিকট যে টাকায় জমি বিক্রয় করেছে, তার চাইতে ১০% টাকা বেশী জমির দাম দিতে হয় এবং তা কোর্টে জমা দিতে হয়; (৩) Co-Sharer বা অন্যওয়ারিশ বা শরীক পাড়া প্রতিবেশীর আগে অধিকার পাবে। (৪) আশে পাশের জায়গার লোকের দাবী শরীক বা রক্তের সম্পর্কের নিকট আত্মীয়ের পরে। Non-Agricultural Tenancy Act—এর ২৪ ধারা মতে শহরের এই ধরনের জমির ক্ষেত্রে আশে পাশের জমির মালিকেরা Pre-emption করে অন্যের নিকট বিক্রীত জমি পুনরায় কিনতে পারবেনা, শুধু Co-sharer বা শরীক বা ওয়ারিশ বা রক্তের সম্পর্কের নিকট আত্মীয়গণ পারবেন এবং এই ক্ষেত্রে আগের ১০% এর স্থলে ৫% টাকা বেশী দিতে হবে।

১৭. স্বার্থ হানির অধিকার আদায়

সম্প্রতি অর্থঋণ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরও আওতা উপরের মামলার মত স্বার্থহানির অধিকার আদায় সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলা। Working Capital ঋণ দেয়া হয় নি তাই Project sustainable না হয়ে Fail করে লোকসান হয়েছে" এই সমস্ত অজুহাতে দেনাদারগণ রেহাই পেতে চেষ্টা করেন। খাতক বা ঋণ গ্রহীতা হেরে গেলে অর্ধেক পরিশোধ না করে উচ্চ আদালতে আপীল করতে পারেন না।

১৮. পারিবারিক আদালতের মামলা

পারিবারিক আদালতের মামলা সহকারী জজদের নিকট না দিয়ে অন্যত্র করলে Subject jurisdiction নষ্ট হয়। ঐ রায় টিকবে না। তাই বিবাহ বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ সংক্রান্ত মামলা সহকারী জজের আদালতে প্রথম করতে হয়। সমাজ বদলে গেছে। মেয়েরা আজকাল আগের চাইতে অনেক সচেতন। তাই মহিলাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য Family Court পাশ হয়েছে। Interlocking Ordinance এর মধ্যে আসে (স্থায়ী ও অস্থায়ী)। রিসিভার নিয়োগ ও অগ্রিম/ক্রোক (Attachment

before Judgement)–এর বিধানও গুরুত্বপূর্ণ। কোন তৃতীয় পক্ষকে কারো আবেদনক্রমে দেওয়ানী আদালত রিসিভার নিয়োগ করতে পারেন যখন কোন মালিকের অভাবে কোন মাল বা সম্পত্তি নষ্ট হবার উপক্রম হয়। যেমন, চোরাই নৌকা, ক্রোকক্রীত ধান ও মাছ বিক্রির জন্য থানার ওসি সাবকে রিসিভার নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

অনেক সময় বাদী অগ্রিম ক্রোকের জন্য দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করেন। কোন মামলা চলছে এমন অবস্থায় বিবাদী তার একমাত্র সম্পত্তি (রঙিন টিভি, শুধু বিঘে দুই জমি ইত্যাদি) বিক্রি করতে যাচ্ছে। তখন বাদী এ বিক্রয় বন্ধ করার জন্য মোকদ্দমার রায়ের আগেই অগ্রিম ক্রোকের জন্য জজ কোর্টে দরখাস্ত করতে পারেন। কারণ উহা বিক্রি হয়ে গেলে বাদীর পাওনা টাকা আদায়ের জন্য বিবাদীর আর কোন সম্পত্তি থাকবে না। ব্যাংক একাউন্ট হতে সমস্ত টাকা উঠিয়ে ফেলার সময়ও এই ধরনের অগ্রিম ক্রোকের আবেদন করা যায়।

১৯. সীমার বাইরে আর্জি করার দণ্ড

মুদি দোকানের খাতায় পাওনা টাকা আদায় এবং ভাউচারে সই করে নেওয়া ঋণের টাকা আদায়ের জন্যও নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে। সীমার বাইরে আরজি পেশ করলে বাদী উল্টা দণ্ডবিধির "৪২০" ধারায় দোষী হয়ে যেতে পারেন মিথ্যা মামলার জন্য।

২০. কিভাবে সম্পত্তি বা অধিকার নিয়ে মোকদ্দমা করতে হয়

আরজি পেশ করার মাধ্যমে মোকদ্দমা করতে হয়? আরজিতে থাকবে– (১) আদালতের নাম (২) বাদীর নাম ও বাসস্থানের ঠিকানা (৩) বিবাদীর নাম ও ঠিকানা (৪) বাদী বা বিবাদীরা কেউ নাবালক কিংবা মানসিক বিকারগ্রস্ত হলে সেই মর্মে বিবৃতি (যেমন জমি মসজিদে দিয়ে দেবে, সন্তানদের সঙ্গে ঝগড়া করে, সেক্ষেত্রে এই ধরনের বিবৃতি দাখিল করতে হয় প্রয়োজনবোধে) (৫) মোকদ্দমার কারণ সৃষ্টিকারী তথ্যসমূহ ও উদ্ভবের সময় (৬) আদালতের এখতিয়ার আছে বলে প্রদত্ত তথ্যসমূহ (৭) বাদী কি চায় বা কি প্রতিকার দাবী করে তা (৮) আদালতের এখতিয়ার ও কোর্ট ফি নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে কাজ করবে, তাই মোকদ্দমার মূল্য সম্পর্কে একটি বিবৃতি এবং এরই ভিত্তিতে কোন কোর্টের আর্থিক এখতিয়ারে আছে তা ঠিক হবে।

২১. মামলা দায়েরর পর আদালতের কর্তব্য

মোকদ্দমা দায়েরের পর দেওয়ানী আদালত কি কার্য সমাধা করবে, তার ধারা বা কার্যধারা সমূহ নিম্নরূপ ঃ

(ক) সমনজারী (২) বর্ণনাপত্র দাখিল (৩) বিচার্য্য বিষয় নির্ধারণ (৪) তদন্ত অনুসন্ধান (৬) চূড়ান্ত বিচারের তারিখ নির্ধারণ (৭) চূড়ান্ত শুনানী (৮) রায় ঘোষণা (৯) ডিক্রী প্রদান (রায়ের ভিত্তিতে) একই তারিখে ও একই বিচারকের স্বাক্ষরে।

২২. সুপারিশমালা

(ক) যেহেতু বাটোয়ারা মামলায় একজন ওয়ারিশও অনুপস্থিত থাকলে বা মারা গেলে তার উত্তরসূরী না এনে মামলা চালানো যায় না তাই দেওয়ানী মামলার সময়কালের কোন শেষ নেই। জজ কোর্ট তাই বাস্তবে কোন গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায়ই দিতে পারেন না এবং তামাদির সময় বাটোয়ারা মামলার ক্ষেত্রে নাই বলে অনেকের খরিদ করা জমির অধিকার ও জমির লাপাত্তা ওয়ারিশদের দাবীর দ্বারা বাতিল হতে পারে; তাই জমি ক্রয়ের পরে অনেকের স্বার্থহানি জনিত কারণে হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হবারও পথ প্রশস্ত হয়। তাই এক্ষেত্রেও তামাদি আইন প্রযোজ্য থাকা বাঞ্ছনীয় এবং ওয়ারিশের অধিকার আদায়ের একটা সময়সীমা বেধে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত ওয়ারিশের অধিকার আদায় না করলে এ জমি খাস হয়ে যাবার ব্যবস্থা থাকলেও বাস্তবে আইনের প্রয়োগ বড় একটা পরিলক্ষিত হয় না। দেওয়ানী মোকদ্দমার বাটোয়ারা মামলায় রায় প্রদানের জন্যও একটা সময় সীমা বেঁধে দেওয়া প্রয়োজন যাতে যেকোন মামলা দুই তিন পুরুষ পর্যন্ত না চলতে পারে; যাতে রায় তাড়াতাড়ি হয়; তখন জজ কোর্টের উপর বৈষয়িক মানুষের আস্থা বাড়বে।

খ) অধিকাংশ দেওয়ানী মামলার আদালতই তৃণমূল পর্যায়ে স্থানান্তর প্রয়োজন যাতে সরেজমিনে কি ঘটছে তা' জানা যায় এবং অল্প পয়সায় গরীব ওয়ারিশেরা মামলার সুফল পায়।

গ) পুরানো ফারায়েজের লা-শরীক আইন, মুসলিম পরিবার আইন-Muslim Family Law Ordinance, ১৯৬১ এর কারণে বর্তমানে অকার্যকর, যদিও এটা

কুরানশরীফের মূল ফারায়েজের আইন।কেন অকার্যকর, এই সম্পর্কে আইনের ভিতরেই একটা ব্যাখ্যা লিখিত থাকা প্রয়োজন যদি তা' লিখিত থাকতো তা হ' লে এই আইনের প্রতি মানুষের আস্থা থাকতো। এখন এই আইন শুধু সন্তানদের বেলায় প্রযোজ্য কিন্তু অনান্য ওয়ারিশের বেলায় প্রযোজ্য নয়। দাদার সামনে পিতা মারা গেলে পিতার সন্তানেরা লা-শরীক হয় না কিন্তু অন্য সম্পর্কের কেউ মারা যাবার পর তার সন্তানেরা লাশরীক হবে না এই ধরনের ব্যবস্থাও ঐ একই আইনে থাকা বাঞ্ছনীয়।

২৩. উপসংহার

দুর্যোগ মোকাবিলায় যুক্তিসঙ্গতভাবে অনেক সময় চলা যায় না, কিন্তু আইন অনেক কিছু বিবেচনা করেই তৈরী করা হয়েছে। আইন মানা অসম্ভব কিছুই নয়।

মানুষের ভিতরে পরমাত্মার প্রতিধ্বনি মানুষ সব সময় শুনতে পায়। চোখেও মৃত আত্মাদের মত মুখচ্ছবি সামনে পড়ে। ইহাই বিবেকের দংশন। সর্বদা মানুষকে ভয় দেখায়, স্মরণ করিয়ে দেয় এবং হালালের বরকত সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়। হারামের জ্বালা-যন্ত্রনা ও অশান্তির শেষ নেই। হালালের বরকত তারা বুঝতে পারবেন না যাদের অভিজ্ঞতা নেই। সুতরাং মানুষকে চিরন্তন আইন, প্রচলিত আইন (জবরদস্ত সাময়িক আইন নয়) যা সার্বজনীন স্বীকৃতি পায় তা মেনে চলা উচিত। যে আইন বাতিল হয়েছে, সে আইনে শাস্তিপ্রাপ্ত আসামীরও মুক্তি হওয়া বাঞ্ছনীয় ও যুক্তিসঙ্গত এবং যে আইনে কাউকে সুবিধা দেওয়া হয়েছে সেই আইন বাতিল হলে অন্যদেরও সুবিধা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। তবে মানুষ যখন সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে কিন্তু আইন পিছনে পড়ে আছে তখন বিপ্লব হয় একথা একজন প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেছেন সুতরাং আইন যুগোপযোগী হয়ে পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত ও সংশোধিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং সেই কারণেই দরকার আছে আমাদের আইন সভা বা জাতীয় সংসদ।

বিঃ দ্রঃ প্রবন্ধটি বিপিএটিসির বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্য বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। ডঃ রফিকুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সাভারে পঞ্চদশ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রদত্ত লেকচার, মার্চ ১৫, ১৯৯৫ হতে জুলাই ১৩, ১৯৯৫ ইং।

২। Obaidul Haq Chowdhury (Advocate), *The upto date civil Reference 1960 The Dhaka Law Reports*, Dacca.

৩। গাজী শামছুর রহমান, *দেওয়ানী আইনের ভাষ্য*, খোজরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, নতুন সংস্করণ জুন, ১৯৮৬।

৪। আবদুস শাকুর, *দেওয়ানী আদালতের বাংলা মুসাবিদা*, দ্বিতীয় সংস্করণ-এপ্রিল ১৯৮৭।

৫। গোলাম মর্তুজা মজুমদার, *আদালতের ব্যবহারিক কার্যবিধি ও আবেদন পদ্ধতি*, পল্লব পাবলিসার্স, ঢাকা, ১৯৮৭।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৌষ ১৪০২

সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ঃ কতিপয় সুপারিশ

মুহম্মদ আব্দুস সালাম

সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদি এবং সরকারী কর্মচারীদের আপীল আবেদন নিষ্পত্তি করার পদ্ধতি বিবৃত করে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ প্রণীত হয়েছে। বিধিমালাটিতে সরকারী কর্মচারীদের শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহ এবং এ সমস্ত অপরাধের কারণে প্রদানযোগ্য শাস্তির বর্ণনা দেয়া আছে। এই শাস্তি প্রদান করতে হলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীতব্য পদক্ষেপ সমূহেরও বর্ণনা এতে দেয়া আছে। পাশাপাশি কোন সরকারী কর্মচারী কোন কারণে সংক্ষুব্ধ বোধ করলে তাঁর প্রতিকার প্রার্থনায় তাঁর করণীয় সম্পর্কেও এ বিধিমালাতে বলা আছে।

২.০ বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের সময় এতদসংক্রান্ত 'কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারী কর্মচারী (দক্ষতা ও শৃঙ্খলা) বিধিমালা' ১৯৬০, প্রাদেশিক সরকারের 'সরকারী কর্মচারী (দক্ষতা ও শৃঙ্খলা) বিধিমালা' ১৯৬০, 'সিভিল সার্ভিসেস (ক্লাসিফিকেশন, কনট্রোল এন্ড আপীল) রুলস্' ১৯৩০, এর ত্রয়োদশ পার্ট ও 'সাব-অর্ডিনেট সার্ভিস (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা' ১৯৩৬, এর তৃতীয় পার্টের বিধানাবলী চালু ছিল। যা পরবর্তীতে বাতিল করতঃ ৩১শে জুলাই, ১৯৭৬, হতে কার্যকর 'সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা' ১৯৭৬ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৬ এর পুর্বোক্ত বিধিমালা বাতিল করে ১৯ শে জুলাই, ১৯৮৪ হতে কার্যকর 'সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা' ১৯৮৪, জারী করা হয় যা পরবর্তীতে আবার বাতিল করে বর্তমান বিধিমালা জারী করা হয়েছে। বর্তমান বিধিমালা ২১ শে আগষ্ট ১৯৮৫ তারিখে বাংলাদেশে গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল। বিধিমালাটি প্রণয়নের পর হতে অবশ্য এতে কিছু সংশোধনীও আনা হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিগত ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ তারিখে জারীকৃত এস আর ও ৩০৪-আইন/৮৯/সম(বিধি-৫)১ডি/৮৮ নম্বর সংশোধনী।

৩.০ বর্তমান বিধিমালাকে আরো বেশী ফলপ্রসূ করতে হলে এ বিধিমালাতে কিছু সংশোধন ও সংযোজনের প্রয়োজন আছে বলে অনেকে মনে করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে এ ধরনের সংশোধন/সংযোজনের কিছু ক্ষেত্র সনাক্ত করে সম্ভাব্য সংশোধন/সংযোজন সম্বন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে এই প্রবন্ধে সনাক্তকৃত সংশোধন ও সংযোজনের ক্ষেত্র সমূহ সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে। বিতর্ক ও আলোচনা শেষে এ ব্যাপারে সঠিক ক্ষেত্রসমূহ সনাক্তকরণ ও সুপারিশ প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই নিবন্ধ একটি সূত্রপাত বা শুরু হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। প্রবন্ধে সংশোধন/সংযোজনের প্রস্তাবিত ক্ষেত্রসমূহ বিধিওয়ারী আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধের কলেবর সংক্ষিপ্ত রাখার প্রয়াসে প্রস্তাবিত সংশোধন/সংযোজনের সুপারিশসমূহই শুধুমাত্র আলোচিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিধিসমূহের বর্তমান বিধান নিতান্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অত্যন্ত সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে।

৪.০ বিধি ২ (ই) তে সরকারী কর্মচারীদের সংজ্ঞা-তে প্রজাতন্ত্রের কর্মে চাকুরীরত ব্যক্তিদের বুঝানো হয়েছে। বিধিমালায় ৩য় ও ৪র্থ পার্টের আপীল এবং পুনর্বিবেচনার আবেদনের ক্ষেত্রে এই বিধিমালার আওতায় চাকুরী হতে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর প্রাপ্ত, অপসারিত ও বরখাস্তকৃত কর্মচারীদেরও ক্ষেত্র বিশেষে আপীল এবং পুনর্বিবেচনার আবেদন দাখিলের অধিকার রয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই বিধিমালায় সরকারী কর্মচারীর সংজ্ঞা অনুযায়ী চাকুরী হতে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর প্রাপ্ত, অপসারিত বা বরখাস্তকৃত একজন ব্যক্তি, আর সরকারী কর্মচারী না থাকায়, এই বিধিমালার আওতায় কোন সুযোগ আর পেতে পারেন না বলে মনে করা যায়। এই অসংগতি দূরীকরণার্থে সরকারী কর্মচারীর সংজ্ঞায় আপীল ও পুনর্বিবেচনার আবেদনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমা অবধি এই বিধিমালার আওতায় শাস্তি প্রাপ্তিতে চাকুরী হতে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর প্রাপ্ত, অপসারিত ও বরখাস্তকৃত সরকারী কর্মচারীদের অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে এবং সে মর্মে সংজ্ঞা সংশোধন করা যেতে পারে।

৫.০ বিধি ৩ (ডি)-তে (১) জ্ঞাত আয়ের সাথে সংগতিবিহীন আর্থিক সম্পদ বা সম্পত্তি দখলে থাকা (২) আয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এরূপ জীবন পদ্ধতি নির্বাহ করা ও (৩) দুর্নীতি পরায়ন হবার ক্রমাগত অপবাদ থাকাকে দুর্নীতির নির্ণায়ক হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা আছে। সাধারণত ঃ দুর্নীতি বলে মনে করা হয় এমন কাজ যথা, একজন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক উৎকোচ গ্রহণ বা সরকারী অর্থ আত্মসাৎ এ বিধির আওতায় দুর্নীতির সংজ্ঞাভূক্ত নয়। শেষোক্ত দু'টি আচরণকে দুর্নীতির সংজ্ঞাভুক্ত করে দুর্নীতির সংজ্ঞা সংশোধন করা যায়।

৬.১ বিধি ৪ এ নিম্নোক্ত ৪টি গুরুদণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ক) নিম্নপদ বা নিম্ন টাইম স্কেলে নামানো।

খ) চাকুরী হতে বাধ্যতামূলক অবসর দান।

গ) চাকুরী হতে অপসারণ।

ঘ) চাকুরী হতে বরখাস্ত।

এই শাস্তিগুলি গুরুত্বের ক্রমানুসারে সাজানো।

৬.২ বিধি ৪(৪) বলা হয়েছে চাকুরী হতে বরখাস্তকৃত ব্যক্তি ভবিষ্যতে সরকারী অফিসে বা আইনের আওতায় বা আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন বডি কর্পোরেট-এ চাকুরী পাবার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন-কিন্তু চাকুরী হতে অপসারিত ব্যক্তি নয়। এখানে চাকুরী হতে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর প্রদত্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে কি বিধান তা সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়নি। যেহেতু চাকুরী হতে বাধ্যতামূলক অবসর দান চাকুরী হতে অপসারণের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে কম গুরুত্ব সম্পন্ন দণ্ড সেহেতু এ ধরনের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও বিধি ৪(৪) মোতাবেক চাকুরী হতে অপসারিত ব্যক্তিদের ন্যায় সুবিধা প্রাপ্তির সুস্পষ্ট উল্লেখ বিধি ৪(৪) এ রাখা যায়।

৭.০ বিধি ৬(১) অনুযায়ী তিরস্কারের চেয়ে বেশী লঘুদণ্ডের আওতায় কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা শুরুর ক্ষমতা, যে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃপক্ষ সেক্ষেত্রে, সংশিষ্ট সরকারী কর্মচারী যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের আওতাধীন তার সচিবকে দেয়া হয়েছে। ১৯৭৫ সনের কার্যবিধিমালার ৪নং বিধির উপবিধি (XII) এর ক্লজ (জি) অনুযায়ী সংস্থাপন মন্ত্রণালয়- কে বাংলাদেশ সরকারের সচিবদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক মামলা শুরুর ক্ষমতা দেয়া থাকায় কার্যতঃ বিধি অনুযায়ী সংস্থাপন সচিব অন্যান্য সচিবগণের বিরুদ্ধে ক্ষেত্র বিশেষে বিভাগীয় তদন্ত মামলা শুরুর ক্ষমতা রাখেন। এক্ষেত্রে সংস্থাপন সচিবকে অন্য যে কোন সচিবের বিরুদ্ধে লঘুদণ্ডের আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা অনেকের দৃষ্টিতে শোভনীয় মনে না হওয়ায় "কোন সচিবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রয়োজন হবে" এই মর্মে একটি বিধি ৬নং বিধিতে যুক্ত করা যায়।

৮.০ বিধি ৬(১) মোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখিতভাবে জ্ঞাত করার ও তাঁর আচরণ ব্যাখ্যার নির্দেশ প্রদানের পর তাঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যা (যদি দাখিল করা হয়ে থাকে) বিবেচনা, ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন জানালে শুনানী গ্রহণ অন্তে অথবা নির্দিষ্ট সময়ে কোন ব্যাখ্যা প্রদত্ত না হলে এই পর্যায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে কোন

লঘুদণ্ড আরোপ করে মামলাটির নিষ্পত্তির বিধান রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা বিবেচনা ও শুনানী গ্রহণের পর উপযুক্ত কারণ না থাকলে মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্যও কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে। অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করে ব্যাখ্যা দাখিল করলে কোন শুনানী গ্রহণ বা তদন্ত ছাড়াই শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে মামলাটির নিষ্পত্তি করা জন্য কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা দিয়ে নতুন একটি উপবিধিও সংযোজন করা যেতে পারে।

৯.১ বিধি ৭(২) এ গুরুদণ্ড আরোপের তদন্ত পদ্ধতির ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনে বিবরণী দাখিলের পর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৩টি বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে–

(১) উপযুক্ত কারণ না থাকলে অভিযোগ প্রত্যাহার–

(২) অপরাধ তুলনামূলকভাবে কম বলে বিবেচিত হলে বিধি ৬(১)– এ বর্ণিত লঘুদণ্ড আরোপের তদন্ত পদ্ধতি গ্রহণ।

(৩) অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গুরুদণ্ড আরোপের জন্য অগ্রসর হবার যথেষ্ট কারণ থাকলে তদন্ত কর্মকর্তা/বোর্ড নিয়োগ।

৯.২ অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ স্বীকার করলে তাঁকে উপযুক্ত গুরুদণ্ড আরোপ করে এই পর্যায়ে মামলাটির নিষ্পত্তি সংক্রান্ত একটি উপবিধি এসাথে যোগ করা যায়। তবে গুরুদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে বিধি ৭(৬) এবং ৭(৭) এ বর্ণিত কারণ দর্শানো নোটিশ এবং প্রয়োজনে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতামত গ্রহণ সংক্রান্ত বিধি পালন করতে হবে মর্মে উল্লেখ রাখা যায়।

১০.০ বিধি ৬(২) এ লঘুদণ্ডের তদন্ত পদ্ধতির ক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করলে বিষয়টিতে আরো তদন্তের (ফারদার ইনকোয়ারী) নির্দেশ দিতে পারেন। (সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ৭–৩–১৯৭৯ তারিখে ইডি(রেগু ৬)/এস–১২৮/৭৮–১৮ (৫০০) নম্বর অফিস স্মারকে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত আছে। গুরুদণ্ডের তদন্ত পদ্ধতির ক্ষেত্রে এ ধরনের আরো তদন্তের কোন বিধান নেই। ৭ নং বিধিতে এ মর্মে একটি উপবিধি সংযোজন করা যেতে পারে।

১১.১ বিধি ৭(৭)– এ যেক্ষেত্রে গুরুদণ্ড প্রদানের জন্য বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতামতের প্রয়োজন সেক্ষেত্রে কমিশনের মতামত গ্রহণের জন্য বলা

হয়েছে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে এটি প্রয়োজন তাঁর বর্ণনা এ বিধিতে দেয়া নেই বা সংশ্লিষ্ট বিধির উল্লেখও এ বিধিতে করা নেই। বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (কনসালটেশন) রেগুলেশন ১৯৭৯- এর রেগুলেশন ৬- এ এতদসংক্রান্ত ব্যাখ্যা দেয়া আছে। বিষয়টি সহজবোধ্য করতে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (কনসালটেশন) রেগুলেশন ১৯৭৯- এর রেগুলেশন ৬- এর আলোকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ অর্থাৎ কোন প্রথম- দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোষিত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে চাকুরী হতে বরখাস্ত/অপসারণ/বাধ্যতামূলক অবসর দান বা পদাবনতির শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বিষয়টি মতামতের জন্য বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনে প্রেরণ করতে হবে এ মর্মে সুস্পষ্ট বিধান সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫- এর বিধি ৭(৭)-এ রাখা যায়।

১১.২ উপর্যুক্ত রেগুলেশন অনুযায়ী একজন প্রথম/দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোষিত কর্মকর্তাকে নিম্ন বেতন স্কেলে অবনমিত করার শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে কমিশনের মতামত গ্রহণের প্রয়োজন নেই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে নিম্ন টাইম স্কেলে অবনত করার ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পদাবনতিও আপনা আপনি ঘটে যায় এবং এ ধরনের একটি ক্ষেত্রে প্রশাসনিক আপীলেট ট্রাইবুনালের বিচারপতি জনাব মোজাম্মেল হক বনাম সচিব, সংস্থাপন বিভাগ মামলায় (আপীল নং-৭৫/১৯৮৫) অন্যান্য কারণসহ আপীলকারীকে নিম্ন টাইম স্কেলে অবনত করার পূর্বে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতামত গ্রহণ না করার কারণে কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্ত বাতিল ঘোষণা করে রায় দিয়েছিলেন।

১১.৩ এ ধরনের ঘটনা নিরসনে প্রথম/দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোষিত কর্মর্তাকে গুরুদণ্ড প্রদানের পূর্বে কমিশনের মতামত নিতে হবে এ ধরনের একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ বিধি ৭(৭) এ সংযোজন করা যায়। উল্লেখ্য বর্তমান অবস্থায় শুধুমাত্র নিম্ন টাইম স্কেলে অবনমিত করা ছাড়া অন্যান্য গুরুদণ্ডের ক্ষেত্রে কমিশনের মতামত গ্রহণ প্রয়োজন।

১১.৪ সাথে সাথে কমিশনের মতামতের সাথে কর্তৃপক্ষ একমত পোষণ না করলে ১৯৭৫ সনের কার্য বিধিমালার বিধি ৬ (III) (সি) মোতাবেক বিষয়টি রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তাও বিধিতে উল্লেখ করা যায়।

১২.০ আলোচ্য বিধিমালায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিধি-৫ মাতাবেক তাঁর বিরুদ্ধে গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি জ্ঞাত করার, বিধি ৬(১)-এ মোতাবেক অভিযোগ লিখিতভাবে জ্ঞাত করার এবং বিধি ৭(১)-এ মোতাবেক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী

কমিউনিকেট করার সুনির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি বর্ণিত নেই। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২৬-৮-৮৯ তারিখের সম (অঃপ্রঃ-১)/ পিএটিসি-২২/৮৯-২৬৮ নম্বর অফিস স্মারক অনুযায়ী এবং বিধির বর্ণনা অনুযায়ী এটি সুস্পষ্ট যে সংশ্লিষ্ট পত্রাদি সরাসরি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জারী করতে হবে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক থাকেন বা সংশ্লিষ্ট পত্র/অভিযোগনামা গ্রহণ না করেন সেক্ষেত্রে কিভাবে পত্র/অভিযোগনামা জারী হবে তাঁর সুস্পষ্ট বর্ণনা বিধিতে দেয়া যায়। উপযুক্ত মনে করলে রেজিষ্টিকৃত ডাকযোগে প্রেরণের পর প্রাপক কর্তৃক গ্রহণে অস্বীকৃতি অথবা শেষ জ্ঞাত ঠিকানায় লটকিয়ে জারী করলেই জারী হয়েছে বলে মনে করা হবে এ মর্মে একটি বিধান বিধিমালায় রাখা যেতে পারে অথবা সরকারী কর্মচারী (বিশেষ ব্যবস্থা) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর ন্যায় অন্ততঃ পক্ষে দু' টি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশই জারীকৃত বলে মনে করা হবে মর্মেও ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

১৩.০ বিধি ১০(৪)- এ তদন্ত কর্মকর্তার নিকট মামলা উপস্থাপনের জন্য একজন উপস্থাপক নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে তবে এ বিধানটি বাধ্যতামূলক করা হয়নি। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে উপস্থাপক নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা যায় এবং প্রয়োজনে উপস্থাপক নিজেকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করতে পারবেন এ মর্মে বিধি ১০(৪)- এ উল্লেখ রাখা যায়।

১৪.০ একজন চাকুরীরত কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত মামলা শুরুর পর মামলা নিষ্পত্তির পূর্বেই তিনি অবসর গ্রহণ করলে অথবা চাকুরীরত নেই বলে গণ্য হলে সে ক্ষেত্রে মামলাটির আইনগত অবস্থা সমন্ধে বিধিতে কিছু বলা হয়নি। অবশ্য গণকর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ এর ১০ নম্বর ধারায় এতদসংক্রান্ত আইনগত বিধান দেয়া আছে। সহজবোধ্যতার সুবিধার্থে বিষয়টি নোট অথবা ব্যাখ্যা আকারে আলোচ্য বিধিমালাতে উল্লেখ করা যায়।

১৫.১ বিগত ১৩-৯-৮৯ তারিখের এস আর ও ৩০৪ আইন/৮৯/সম (বিধি-৫)/১ডি/৮৮ নম্বর বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশোধনীর পর বর্তমানে বিভাগীয় তদন্ত মামলার পদ্ধতিতে যথাক্রমে ২ ও ৩ মাস নির্দেশক সময়সীমা বেধে দেয়া হয়েছে। বিভাগীয় তদন্ত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২১/১০/৮৯ তারিখের সম/ডি-৫-৯৮/৮৯-৩৩৫/২(১০৫) নম্বর স্মারকে তাগিদ দেয়া হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সুনির্দিস্ট সময়সীমার অভাবে বিভাগীয় তদন্ত মামলা নিষ্পত্তিতে অহেতুক বিলম্বের সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে এবং যেসমস্ত যুক্তি ও কারণে ১৯৮৪ সনে বিভাগীয় তদন্ত

মামলা নিষ্পত্তির বিভিন্ন ধাপে সময় সীমা আরোপ করে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৪ জারী করা হয়েছিল সে সমস্ত যুক্তি ও কারণের প্রতি কোন সুবিচার করা হচ্ছে না বলেই বলা চলে।

১৫.২ অবশ্য সময়সীমা থাকার ফলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বিভাগীয় তদন্ত মামলার বিচার শেষ করতে না পারার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত দোষী ব্যক্তিও সময়সীমার সুযোগে নির্দিষ্ট সময় অন্তে আপনাআপনি অভিযোগ হতে অব্যাহতি পাচ্ছিলেন এ কথাটিও সত্য। কিন্তু তাই বলে সময়সীমা সম্পূর্ণভাবে তুলে দিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য একজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিভাগীয় তদন্ত মামলায় বিচারাধীন রাখার সম্ভাবনাও সমর্থন করা যায় না।

১৫.৩ এ অবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ে বিভাগীয় তদন্ত মামলার বিচার শেষ না হলে দায়ী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধিগত দিকটি সঠিকভাবে পালন নিশ্চিত করে প্রয়োজনে সময়সীমা কিছুটা বর্ধিত করে হলেও সময়সীমা পুনরায় আরোপের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৫.৪ একই সাথে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে এবং যে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে প্রয়োজন মনে করলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বিভাগীয় তদন্ত মামলার বিচার শেষ না হবার কারণে আপনাআপনি অভিযোগ হতে অব্যাহতি পাওয়ার ক্ষেত্রে মামলাসমূহ পুনরায় চালু করতে পারার বিশেষ ক্ষমতা প্রদান সম্পর্কিত একটি বিধি বিধিমালাতে সংযোজন করা যেতে পারে। এই ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেধে দেয়া যায়।

১৬.০ ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ এর সংশোধনীর পূর্ব পর্যন্ত উক্ত সংশোধনী দ্বারা বিলুপ্ত বিধি ১১(২) মোতাবেক সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত একজন সরকারী কর্মচারীর বরখাস্ত করণের ৩০টি কার্যদিবসের মধ্যে বিধি– ৬ অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তাঁকে জ্ঞাত করা অথবা বিধি–৭ অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে প্রণীত অভিযোগনামা তাকে জারী (কমিউনিকেট) করা না হলে উক্ত ৩০টি কার্য দিবসের পর সাময়িকভাবে বরখাস্ত করণের আদেশ নাকচ (ভ্যাকেট) হয়ে যেত। কর্তৃপক্ষীয় হয়রানিমূলক আচরণের মোকাবিলায় এটি একটি যথার্থ রক্ষা কবচ ছিল। বর্তমানে এ উপবিধিটি বিলুপ্ত ঘোষণার ফলে একজন কর্মচারীকে বিনা বিচারে সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত অবস্থায় দীর্ঘ দিন হয়রানি করার সুযোগ কর্তৃপক্ষের হাতে রয়ে গেছে, যার অপব্যবহারের

সম্ভাবনা একেবারে নাকচ করে দেয়া যায় না। এ অবস্থায় বিলুপ্ত বিধি –১১(২) পুনরায় সংযোজন করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা যায়।

১৭.০ বর্তমানে তদন্তকারী কর্মকর্তা/তদন্ত বোর্ড বা কমিটির কোন সদস্যের পরিবর্তনের কোন বিধান বিধিমালাতে নেই বিধায় তদন্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত বোর্ড/কমিটির সদস্যের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন আপত্তি থাকলে তার প্রতিকারের পন্থাও বিধিতে নেই। এ অবস্থা নিরসনে তদন্তকারী কর্মকর্তা বা বোর্ড/কমিটির কোন সদস্যের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন সংশয় থাকলে তাঁর আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে, আপত্তি যুক্তিসংগত বিবেচিত হলে, অথবা অন্য কোন প্রশাসনিক কারণে তদন্ত কর্মকর্তা বা বোর্ড/কমিটির কোন সদস্য পরিবর্তনের সুযোগ সম্বলিত কোন বিধান বিধিতে সংযোজন করা যায়। তবে এও উল্লেখ করা যায় যে অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষ হতে নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত আপত্তি তদন্ত শুরুর পূর্বেই দাখিল করতে হবে। তদন্ত শুরুর পরবর্তী পর্যায়ে এ ধরনের আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না, তদন্ত শুরুর পর প্রশাসনিক কারণে তদন্ত কর্মকর্তা পরিবর্তিত হলে তদন্ত/সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পূর্ণ নতুনভাবে অনুষ্ঠিত হবে, না পূর্ব তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্তের পর্যায় হতে তা শুরু হবে সে ব্যাপারেও বিধিতে সুনির্দিষ্ট উল্লেখ সম্বলিত একটি উপবিধি যুক্ত করা যায়।

১৮.০ আমরা জানি আলোচ্য বিধিমালাতে একজন কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনে কারণ দর্শাবার সুযোগ দানের বিধান আছে। কর্তৃপক্ষীয় হয়রানিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ বিধান নিঃসন্দেহে সরকারী কর্মচারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ। কিন্তু বিধি- ৫ অনুযায়ী যদি রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনক ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে এই সুযোগদান সমীচীন নয় তবে এ সুযোগ রহিত করার বিধান আছে। আবার বিধি– ৮(বি) অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তিকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করার ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোন কারণে (যা উক্ত কর্তৃপক্ষ লিপিবদ্ধ করবেন) উক্ত ব্যক্তিকে কারণ দর্শাবার সুযোগদান যুক্তিসংগতভাবে সম্ভব নয়, তাহলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এ সুযোগ হতে বঞ্চিত করা যাবে। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দেবার এই বিধানদ্বয় অবশ্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৫–(২) (আ) ও (ই) মোতাবেক রাখা হয়েছে। কারণ উক্ত অনুচ্ছেদেই এ ধরনের বিধান রাখা আছে। রাষ্ট্রপতিকে যে বিশেষ কারণে ক্ষমতা দেয়া আছে তা বিতর্কের উর্ধে। কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনে কারণ দর্শাবার যুক্তিসংগত সুযোগ হতে বঞ্চিত করার

ক্ষমতা সমস্ত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে প্রদান কতটা যুক্তি সংগত তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। কারণ ক্ষমতা যত সম্প্রসারিত হয় অপব্যবহারের সম্ভাবনা তত বেশী থেকে যায়। বিশেষ করে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ করার ক্ষমতা যেখানে অনেকেই রাখেন। বিধিতে অবশ্য বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করার ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তৃপক্ষকে এ ক্ষমতা দেয়া আছে। কার্যতঃ যেহেতু নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এ ধরনের শাস্তি প্রদানে সক্ষম সেহেতু সকল নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষই এ ক্ষমতা রাখেন। সংবিধানের অনুচ্ছেদ –১৩৫ (৩) অনুযায়ী কারণ দর্শাবার সুযোগদান যুক্তি সংগতভাবে সম্ভব কি না, এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে সে ব্যাপারে পূর্বোক্ত বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে। অর্থাৎ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দেবার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল চলবেনা, এ ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আত্মপক্ষ সমর্থনে সুযোগ না দেবার এই ক্ষমতা সকল ক্ষেত্রেই নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে প্রদান না করে ক্ষেত্রবিশেষে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে প্রদান করার অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট স্তরের কর্তৃপক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সুপারিশ রাখা যায় কিনা তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা যেতে পারে। উল্লেখ্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার পরই কেবলমাত্র বিধিমালা সংশোধন সম্ভব। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে এ বিধানটির মূল উৎস সংবিধান।

১৯.০ সহজবোধ্যতার স্বার্থে সমস্ত সংশোধন/সংযোজনসহ মূল বিধিমালাটি বাংলায় প্রণয়ন ও জারী করা যেতে পারে। নতুন বিধিমালার সাথে এতদসংক্রান্ত সমস্ত নির্বাহী আদেশ এবং বিধি/আইনের সংশ্লিষ্ট অংশ সংযোজনী হিসাবে সংযোজন করা যেতে পারে, যাতে এ ক্ষেত্রে একজন নতুন পাঠক/কর্মচারী সহজেই সবকিছু অবগত হতে পারেন।

২০.০ আশা করা যায় আলোচিত সংশোধন/সংযোজন সমূহ সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫' কে আরো বেশী যুগোপযোগী ও ফলপ্রসূ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বিঃ দ্রঃ ১. প্রবন্ধটি ২৪–২৯শে এপ্রিল, ১৯৯১ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত "দেশে প্রচলিত আইন ও বিধি–প্রবিধি" বিষয়ক সেমিনারে প্রথম পঠিত হয়।

২. প্রবন্ধটি বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া মডিউলের পাঠ্যবিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

1. *The Government Servants (Efficiency and Discipline) Rules, 1960*, contained in the then Government of Pakistan, Establishment Division notification No. S. R. O. 2 (R), dated the 19th January, 1960;
2. *The East Pakistan Government Servants (Efficiency and Discipline) Rules*, 1960, contained in the then Government of East Pakistan, Finance Department Notification No. F (L.A)/Is-35/60/82, dated the 16th March, 1960;
3. Part X111 of the *Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules*, 1930;
4. Part 111 of the *Subordinate Services (Discipline and Appeal) Rules, 1936;*
5. *The Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1976;*
6. *The Government Servants (Discipline and Appeal) Rules*, 1984;
7. *The Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1985;*
8. *The Constitution of the Peoples Republic of Bangladesh*, 1972.
9. *Rules of Business*, 1975.
10. *Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations*,1979.
11. *The Public Servants (Retirement) Act*, 1974.

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৌষ ১৪০২

আর্থব্যবস্থাপনা বিধি–প্রবিধি ও আইনকানুন

রণজিৎ কুমার চক্রবর্তী

১. ভূমিকা

সুসংহত সরকারী আর্থব্যবস্থাপনা যে কোন দেশে সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক পূর্বশর্ত। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। বিশেষতঃ বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশ রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় শক্তিশালী সরকারী আর্থব্যবস্থাপনার ভূমিকাকে অপরিহার্য করে তুলেছে। প্রাক–বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে যখন রাষ্ট্রের ভূমিকা কেবল আইন–শৃঙ্খলা রক্ষা এবং রাজস্ব সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, জনসাধারণের জীবনযাত্রার সঠিক মান উন্নয়নে যখন রাষ্টর ভূমিকা প্রায় অনুপস্থিত ছিল এবং এসব কারণে যখন সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্র ততটা ব্যাপক হয়নি তখন সরকারী আর্থব্যবস্থাপনা যতটা সরল ও সংকীর্ণ ছিল বিশ্বযুদ্ধত্তরকালে সরকারী ব্যয় নানাভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় এর ব্যবস্থাপনা ক্রমান্বয়ে জটিল এবং ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ব্যাপকতাও সরকারী আর্থ ব্যবস্থাপনায় অব্যাহতভাবে নতুন নতুন মাত্রা যোজনা করতে করতে থাকে । সঙ্গত কারণেই এই প্রক্রিয়ায় সরকারী আর্থ ব্যবস্থাপনা যে বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে তা সুসংহত রাখার প্রসঙ্গটি বর্তমান পর্যায়ে অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে, কারণ এই ব্যবস্থাপনা একদিকে যেমন অর্থবহ হতে পারেনা তেমনি অপরদিকে এক্ষেত্রে সুসংহতির অভাব রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থায়ও জটিলতা ডেকে আনতে পারে। এছাড়া আমরা জানি আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরকারের দায় বদ্ধতা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ বলে বিবেচিত। কাজেই যদি সরকারী আর্থব্যবস্থাপনাকে সুসংহত রাখা না যায় তাহলে সরকারের কাছ থেকে যে মাত্রার দায়বদ্ধতা প্রত্যাশিত, তা অর্জন করা একদিকে যেমন সহজসাধ্য হবে না, তেমনি অপরদিকে এর পরিণামে সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতাও সংকটাপন্ন হতে পারে।

রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সরকারী আর্থব্যবস্থাপনাকে সুসংহতভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন সময়োপযোগী আর্থিক আইন কানুন। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই সরকারী আর্থব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতকে সামনে রেখে আর্থিক বিধিবিধান প্রণীত হয়েছে এবং হচ্ছে।

একথা সর্বজনবিদিত যে বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত আর্থিক বিধিবিধানের অধিকাংশই বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমলে প্রণীত এবং প্রবর্তিত হয়েছিল। কাজেই এই সব বিধি বিধানে স্বাভাবিকভাবেই সেই সব উপাদানের উপস্থিতি রয়েছে যা আমাদের বর্তমান প্রয়োজনের অনুসারী নয়। আমাদের প্রয়োজন উন্নয়নমুখী প্রশাসন অনুসারী আর্থিক বিধিবিধান।

স্বাধীনোত্তর কালে দেশে নতুন ধ্যান ধারণায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সূচনা উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা, বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের সম্পৃক্তি–এসব মিলিয়ে সরকারী আর্থব্যবস্থাপনা দৃশ্যপটে যে সব নতুন নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে তারই নিরিখে আমাদের আর্থিক বিধিবিধান ঢেলে সাজনো প্রয়োজন। একথা সত্য কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব বিধিবিধানের কিছু অংশ সংশোধিত হয়েছে কিংবা নতুন ধারা সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই সংয়োজনের প্রক্রিয়া এতই মন্থর এবং আংশিক যে তা দ্রুত পরিবর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে পারছে না । স্বাধীনতার পর আমরা ইতোমধ্যে যে কালপর্ব অতিক্রম করছি তাতে এ বিষয়ে নিস্পৃহ নিশ্চেষ্ট থাকার অবকাশ খুবই কম। কাজেই এই মুহর্তে একান্ত জরুরী আমাদের দেশে বর্তমানের প্রচলিত আর্থিক বিধিবিধানগুলো সঠিকভাবে পর্যলোচনা করে এগুলোর ত্রুটিসমূহ চিহ্নিতকরণ, ইতিমধ্যে যে সব ক্ষেত্রে নতুন বিধিবিধান প্রবর্তিত হয়েছে কিংবা যে সব ক্ষেত্রে সংশোধন আনা হয়েছে তার পর্যাপ্ত মূল্যায়ন এবং আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অতীতে প্রবর্তিত আর্থিক আইন কানুনের সারোৎসার সংগ্রহ করে নূতন আঙ্গিকে সেগুলো ঢেলে সাজানোর দিক–নির্দেশ রচনা করা। বর্তমান প্রবন্ধে এসব বিষয়েই সামান্য আলোপাত করা হবে।

২. বাংলাদেশে প্রবর্তিত আর্থিক বিধি–বিধান সংক্রান্ত মৌলিক পুস্তকাদি ও নির্দেশাবলী

একথা অনস্বীকার্য যে বৃটিশ শাসনামলেই অবিভক্ত ভারতবর্ষে সরকারী আর্থব্যবস্থাপনা আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। বিশেষতঃ ১৯৩৫ সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্টে

আর্থিক বিষয়দি সম্পর্কিত সুস্পষ্ট কিছু বিধি-বিধানের উল্লেখ করে সরকারী আর্থব্যবস্থাপনার যে রূপরেখা ফুটিয়ে তোলা হয় তা উত্তরকালে ভারত বিভাগের পরও স্বাধীন ভারত পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের সরকারী আর্থব্যবস্থাপনায় ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশেও যে সব আর্থিক বিধিবিধান বলবৎ আছে এবং সেগুলোর উপর ভিত্তি করে যে সংকলন তৈরী করা হয়েছে সেগুলো প্রধানত ১৯৩৫ সনের গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্টে বর্ণিত বিধিবিধানেরই অনুযায়ী। নিম্নে বাংলাদেশে প্রবর্তিত বিধিবিধান সংক্রান্ত মৌলিক পুস্তকাদি এবং নির্দেশাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিত দেয়া হলোঃ

(ক) মৌলিক পুস্তকাদি

(১) বাংলাদেশ ট্রেজারী রুলসঃ ১৯৬৮ সালে 'Treasury Rules, East Pakistan and the Subsidiary Rules made there under' শীর্ষক একটি সঙ্কলন প্রকাশ করা হয় । বাংলাদেশ ট্রেজারী রুলস ঐ সঙ্কলনটিরই হুবহু পুর্নমুদ্রণ। ঐ সঙ্কলনে ১৯৪৪ সালে জারিকৃতক ট্রেজারী সংক্রান্ত বিধিমালা এবং নির্দেশবলীর বহু কিছু গ্রহণ করা হয় এবং তদকালে পাকিস্তানের সাংবিধানিক ধারার অনুসরণে যে সব বিধির সংশোধন ও পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা সেই সব বিধির সংশোধিত ও পরিবর্তিত রূপকে ধারণ করা হয়। ট্রেজারী রুলস দুই খন্ডে প্রকাশিত। প্রথম খন্ডে রয়েছে বিধিবিধানের মূল-পাঠ এবং দ্বিতীয় খন্ডে রয়েছে বিভিন্ন ফরম ও পরিশিষ্ট।

(২) ইস্ট বেংগল ফিন্যানশল রুলস্ (বি, এফ, আর) ঃ এই সঙ্কলনটা মূলতঃ বিভাগ পূর্ব বাংলার সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'Bengal Financial Rules এর পুনর্মুদ্রণ। 1953 'East Bengal Financial Rules' নামে সঙ্কলনটি প্রথম পুনমুর্দ্রিত হয়। বাংলাদেশে এতে বর্ণিত বিধিবিধানের কোনরূপ পরিবর্তন ও সংশোধন ছাড়া এটাই নামে পুনর্মুদ্রণ করা হয়।

(৩) ফান্ডামেন্টাল রুলস্ ও সাপ্লিমেন্টারী রুলস্ (এফ আর ও এস আর) ঃ অবিভক্ত ভারতবর্ষে ১৯২২ সাল থেকে বলবৎযোগ্য ফান্ডামেন্টাল রুলস্-এ প্রয়োজন মাফিক পরিবর্তন ও সংশোধন এনে ১৯৫১ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানে সঙ্কলনটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে সঙ্কলনটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এটি দুই খন্ডে প্রকাশিত। প্রথম খন্ডে রয়েছে বিধিবিধানের মূল পাঠ এবং দ্বিতীয় খন্ডে রয়েছে পরিশষ্ট ও ফরমসমুহ।

(৪) **বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ (বি, এস, আর) ঃ** ১৯৫৩ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানে 'East Pakistan Service Rules' নামে বিভাগ পূর্ব কালের 'East Bengal Service Rules' এর একটি পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর পর ১৯৭০ সালে সঙ্কলনটির প্রথম সংস্করণে বিধৃত বিধিবিধানের সংশোধনসহ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ মূলত ১৯৭০ সালের 'East Pakistan Service Rules'এর দ্বিতীয় সংস্করণ আকারে প্রকাশিত সঙ্কলনের পুনর্মুদ্রণ।

(৫) **জেনারেল ফিন্যানশল রুলস্ (জি, এফ, আর) ঃ** ১৯৫১ সালে তদানীন্তনন পাকিস্তানে সঙ্কলনটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সিভিল এ্যাকাউন্ট কোড, বুক অব ফিন্যানশল পাওয়ারস্ অডিট কোড, এ্যাকাউন্ট কোড এর বিভিন্ন ধারা এই সঙ্কলনটিতে সংযোজিত হয় এবং পাকিস্তানে বিদ্যমান তৎকালীন পরিস্থিতি অনুযায়ী সাধারণ আর্থব্যবস্থাপনার উপর নতুন ভাবে প্রণীত বিধিবিধানও এতে ধারণ করা হয়। বিধিবিধানের কোনরূপ সংশোধন ও পরিবর্তন ছাড়াই সঙ্কলনটি বাংলাদেশে পূনর্মুদ্রিত হয়। প্রথম খন্ডে বিধিবিধানের মূল–পাঠ এবং দ্বিতীয় খন্ডে পরিশিষ্ট ও ফরমসহ এই সঙ্কলনটিও দুই খন্ডে প্রকাশিত।

(৬) **ফিন্যানশল ইনস্ট্রাকশনস্ ফর দি গাইডেনস অব বাংলাদেশ শিমশনস এ্যাবরড ঃ** ১৯৬৬ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানে চীপ এ্যাকাউন্টস অফিসার, মিনিষ্টি অব ফরেন এ্যাফেয়ার্স কর্তৃক এ বিষয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কিছু কিছু সংশোধন আনয়ন করে ১৯৮৩ সালে পুস্তিকাটির প্রথম পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

(খ) নির্দেশাবলী

(১) জাতীয় সরকার কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহারের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা মালা (বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত);

(২) উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ বরাদ্দ, অবমুক্তি এবং সদ্ব্যবহারের পদ্ধতি (বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত);

(৩) প্রভিশনাল রিভাইসড কোড লিষ্ট অব মেজর হেড অব এ্যাকাউন্টস,

(৪) সংশোধিত পেনশন রুলস;

(৫) প্রভিডেন্ট ফান্ড রুলস্ ১৯৭৯;
(৬) সেফ তহবিলের পরিচালন পদ্ধতি;
(৭) বেনিভোলেন্ট ফান্ড এবং গ্রুপ ইনসিওরেন্স অধ্যাদেশ;
(৮) ডেলিগেশান অব ফিন্যানশন, পাওয়ারস্ ইত্যাদি।

৩. আর্থিক বিধিবিধানের শ্রেণী বিন্যাস

বাংলাদেশে যেসব আর্থিক বিধিপ্রবিধি ও আইন-কানুন প্রবর্তিত রয়েছে প্রয়োগের ক্ষেত্র অনুযায়ী নিম্নোক্ত উপায়ে সেগুলোর শ্রেণীবিন্যাস করা যেতে পারেঃ
শ্রেণী যে সঙ্কলন/ পুস্তিকায় সংশ্লিষ্ট শ্রেণী বিধি-বিধান উল্লেখ করা হয়েছে ।

ক। ব্যক্তিগত দাবী সংক্রান্ত-
এফ আর ও এস আর বি এস আর, প্রভিডেন্ট ফান্ড রুলস এবং বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত সরকারী নির্দেশাবলী।

খ। আনুষঙ্গিক ব্যয় সংক্রান্ত-
জি এফ আর ও বি এফ আর।

গ। পূর্ত ব্যয় সংক্রান্ত-
সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস একাউন্ট কোড, জি এফ আর, বি এফ আর এবং ডেলিগেশন অব ফিন্যানশল পাওয়ারস।

ঘ। উন্নয়ন ব্যয় সংক্রান্ত-
বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত সরকারী নিদের্শাবলী।

ঙ। সংক্রান্ত সাধারণ আর্থিক ব্যবস্থাপনা -
জি আর, বি এফ আর, ট্রেজারী রুলস এবং বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত সরকারী নির্দেশাবলী।

উপরিউক্ত শ্রেণীবিন্যাস থেকে লক্ষ্য করা যাবে যে কোন শ্রেণীর দাবী/ব্যয় সংক্রান্ত নির্দেশাবলী কোন একটি নির্দিষ্ট সঙ্কলন/পুস্তিকার অন্তভুক্ত নয়, বরং এগুলো বিভিন্ন নামের সঙ্কলন/পুস্তিকায় ছড়িয়ে আছে।

স্বাধীনোত্তর কালে বাংলাদেশে প্রবর্তিত আর্থিক বিধিবিধানে পরিবর্তনের ধারা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে প্রবর্তিত আথিক বিধিবিধানে যে সব পরিবর্তন আনা হয়েছে তা আংশিক। এই সব পরিবর্তনের ধারা অনুযায়ী একথাও বলা যেতে পারে যে এগুলো কেবল তাৎক্ষণিক প্রয়োজনেরই পরিপূরক ছিল। এছাড়া এটাও

লক্ষণীয় যে বিভিন্ন সময়ে সরকারী প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র 'স্মারকলিপি ইত্যাদির মাধ্যমে নতুন আর্থিক বিধিবিধান জারী এবং ক্ষেত্র বিশেষ প্রচলিত আর্থিক বিধিবিধান সংশোধন ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সূচিত হলেও আর্থিক বিধিবিধান সংক্রান্ত মৌলিক পুস্তকাবলীতে এগুলোর প্রতিফলন ঘটেনি। এতে আর্থিক যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্বাহীদের বিভ্রান্তির মধ্যে পড়তে হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তারাও সরকারী নির্দেশের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন।

এবার যেসব পরিপ্রেক্ষিতকে সামনে রেখে আর্থিক বিবিধানে পরিবর্তন আনা হয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা যেতে পারে, যেমন– (১) সরকারের হিসাব বিভাগীয়করণ এবং হিসাব বিকেন্দ্রীকরণের পেক্ষাপটে আর্থিক বিধিবিধানে কিছু কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে নতুন ধারাও সংযোজিত হয়েছে, (২) বাজেট প্রক্রিয়া এবং হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সরলীকরণের প্রয়োজনে মুখ্যখাত ও মৌলখাতের সংশোধিত তালিকা প্রবর্তিত হয়েছে। (৩) পেনশন পরিশোধ প্রক্রিয়া সহজীকরণের জন্য সংশোধিত পেনশন বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। (৪) উন্নয়ন ব্যয় ত্বরান্বিত করা সম্পর্কিত সেফ তহবিল পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে, (৫) থানা পর্যায়ে উন্নয়ন তহবিলের ব্যবহার সম্পর্কিত বিধিমালা প্রবর্তিত হয়েছে ইত্যাদি।

বাংলাদেশে প্রচলিত আর্থিক বিধিবিধানের সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটিসমূহ

বাংলাদেশে প্রচলিত আর্থিক বিধিবিধানের সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করা অত্যন্ত জরুরী একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে তবে এককভাবে কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে একাজ সম্পর্কে করা সম্ভব নয়। বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ নিয়ে দলীয় আলোচনা,অনুসন্ধান এবং পর্যলোচনার মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পূর্ণ হতে পারে। যাহোক, এবিষয়ে প্রথমিক পর্যালোচনার মাধ্যমে যে সব সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি চিহ্নিত করা হয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

ক) স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আর্থিক বিধিবিধান সংক্রান্ত যেসব সরকারী আদেশ জারী করা হয়েছে সেগুলোর বিষয় ভিত্তিক সঙ্কলন না থাকা, যেমন– (১) বেতন ও ভাতা সংক্রান্ত মূল আদেশ এবং পরবর্তী পর্যায়ে এগুলোর

সংশোধন ও পরিবর্তন সংবলিত আদেশ, (২) প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন, বেনিভোলেন্ট ফান্ড, গ্রুপ ইনসিওরেন্স ইত্যাদি বিষয়ে জারিকৃত আদেশাবলী, (৩) প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রেক্ষাপটে থানা পর্যায়ে হিসাব রক্ষণ অফিস প্রতিষ্ঠা এবং হিসাব বিভাগীয়করণের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রধান হিসাব রক্ষণ অফিস প্রতিষ্ঠা এবং হিসাব বিভাগীয়করণের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রধান হিসাব রক্ষণ অফিসারের অফিস প্রতিষ্ঠার সূত্রে জারিকৃত আর্থিক বিধি-বিধান সংবলিত বিভিন্ন সরকারী আদেশ, (৪) উন্নয়ন তহবিল বরাদ্দ, অবমুক্তি ও যথাযথ ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে জারিকৃত নির্দেশাবলী ইত্যাদির বিষয় ভিত্তিক সঙ্কলন না থাকায় যাঁদের জন্য এগুলো অনুসরণীয় তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই এই সব আদেশ ও নির্দেশাবলী তাৎক্ষণিকভাবে খুঁজে পাননা। ফলে তাঁদের পক্ষে অনেকক্ষেত্রেই এগুলোর বাস্তব প্রয়োগ সহজে সম্ভব হয় না।

খ) তদানিন্তন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ের দুই সেট রুলস্ পাশাপাশি বলবৎ রাখা, যেমন -বাংলাদেশ ট্রেজারী রুলস্ (যা Treasury Rules, East Pakistan এর পুনর্মুদ্রণ) এবং তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের কমপাইলেশন অব ট্রেজারী রুলস্, (২) বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ (যা East Pakistan Services Rules এর পুনর্মুদ্রণ) এবং তদানিন্তন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক জারীকৃত ফান্ডামেন্টাল রুলস্ ও (৩) জেনারেল ফিন্যানশল রুলস্ এবং ইস্ট বেংগল ফিন্যানশল রুলস্। আলোচ্য ক্ষেত্রগুলোতে দুই সেট রুলস্ বলবৎ থাকায় এগুলো যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক সময় দ্বিধাগ্রস্ত হ'তে হয়।

গ) যে সব বিধিবিধান স্পষ্টতই অকার্যকর আর্থিক, আইনকানুন সংক্রান্ত মৌলিক পুস্তকাবলীতে সেই সব বিধি-বিধান সন্নিবেশিত রাখা। যেমন-(১) বাংলাদেশ ট্রেজারী রুলস্ শীর্ষক সঙ্কলনটির Part-1 (Treasury Rules), Section-X (Inter Government Transactions), Section XI (Receipts and Disburnements in the United Kingdom), Part-11 (Subsidiary Rules)-এর Chapter (iv)-এর Section-111 (verification of.........), Chapter (iv)-এর S, R 82

(Investment of Surplus cash of the Provincial Government) (পরিশিষ্ট–'ক'), (২) জেনারেল ফিন্যানশল্ রুলস্ শীর্ষক সঙ্কলনটির Chapter-3 (Revenues and Receipts)- এর অধীন ৩৪ নং অনুচ্ছেদ, Chapter-4 (Powers of Sanction) এর অধীন ৩৯–৪৪ (এ) নং অনুচ্ছেদ, Chaper-11 এর অধীন ২১৭–২২২ নং অনুচ্ছেদ, Chapter-12 এর অধীন ২৩৪, ২৬৬ এবং ২৬৭ নং অনুচ্ছেদ এবং Chapter-15 এর অধীন ৩১৬–৩১৯ নং অনুচ্ছেদ (পরিশিষ্ট 'খ' দ্রষ্টব্য), এর (3) B.S:R. Part-11- Rules 29,42,47,57, 100 (1), 158 Appendix No 16 (পরিশিষ্ট 'গ')।

ঘ) আর্থিক আইন–কানুন সংক্রান্ত মৌলিক পুস্তকাবলীর সহজ ভাষ্য না থাকা, যেমনঃ এফ আর ও এস আর, বি এস আর, বি এফ আর এসব সংকলনে ব্যবহৃত ভাষা অনেকক্ষেত্রেই সহজবোধ্য নয়। ফলে যাঁরা এসব সঙ্কলনের প্রাথমিক ব্যবহাকারী তাঁরা সবচেয়ে বেশী অসুবিধায় পড়েন এবং এতে সঙ্কলন গুলোতে বর্ণিত বিধিবিধানের আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ প্রায়শই বিলম্বিত হয়।

ঙ) নতুন ভাবে প্রণীত আর্থিক বিধিবিধান মৌলিক সঙ্কলনগুলোতে সংযোজনের সহজ ব্যবস্থা না থাকা, অর্থাৎ এই সব সঙ্কলন বাঁধাইয়ের কাজ যেভাবে করা হয়েছে তাতে নতুন প্রণীত বিধিবিধান সংযোজন করা সম্ভব নয়। এছাড়া এগুলোর এই সব পুস্তকাদির মুদ্রণও আকর্ষণীয় নয় , বিশেষ করে এই সব সঙ্কলনে ব্যবহৃত টাকা সমূহ এত ছোট হরফে মুদ্রিত যে এগুলো সহজে পাঠ করার মত নয়। ফলে এসব সঙ্কলন কার্যত ব্যবহারের আগ্রহ অনেক ক্ষেত্রে কমে যায়।

চ) প্রচলিত আর্থিক বিধি–প্রবিধিতে অনেক ক্ষেত্রেই এমন আর্থিক সীমা (Financial limit) দেয়া আছে যা বর্তমান মূল্য পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেমন (১) সরকারী কাজে ব্যবহার্য বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী ক্রয়ের বিষয়ে জি এফ আর– এর ১৪৪ অনুচ্ছেদের Annexure-A তে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী ৫০০০.০০ বা তদুর্ধ মূল্যের সামগ্রী ক্রয়ের জন্য পাবলিক এ্যাডভারটাইজেমেন্ট এর মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করা প্রয়োজন। কিন্ত বর্তমান সময়ে যে কোন দৈনিক কাগজে এধরনের একটি বিজ্ঞাপন ছাপানোর ব্যয়ই ট ৫০০০.০০ এর উর্দ্ধে। কাজেই জি, এফ, আর–এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী সরকারী কাজে ব্যবহার্য সামগ্রী ক্রয় করলে তা অনেক ক্ষেত্রেই আর্থিক দিক থেকে যুক্তিযুক্ত বলে প্রতীয়মান হবেনা; (২) সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে প্রদেয় ভ্রমণকালীন দৈনিকভাতা ও রোড মাইলেজ্, দায়িত্ব ভাতা, গৃহ নির্মাণ অগ্রিম, মোটর

কার অগ্রিম, মোটর সাইকেল অগ্রিমএসব ক্ষেত্রে যে আর্থিক সীমা দেয়া আছে তা বর্তমান বাজার পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, (৩) দেশের অভ্যন্তরে কর্মরত বিভাগীয় প্রধানদের গাড়ী মেরামত, ষ্টেশনারী সামগ্রীর স্থানীয় ক্রয়, অফিসের আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয় অথবা মেরামত, স্থানীয় ছাপাখানায় ফরম ছাপানোর খরচ, অনাবাসিক বাড়ীর ভাড়া এই সব বিষয়ে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতা এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন প্রধানদেরকে প্রদত্ত ষ্টেশনারী সামগ্রীর স্থানীয় ক্রয় অফিসের জন্য ব্যবহার্য আসবাব পত্রের হায়ার চার্জ এবং আপ্যায়ন খরচের ব্যাপারে প্রদত্ত অনুরূপ ক্ষমতা বাজার পরিস্থিতির তুলনায় নেহায়েতই অপ্রতুল বলে মনে হয়।

উপরে যে সব ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা হয়েছে তা বাংলাদেশে প্রচলিত আর্থিক বিধিবিধানে বিদ্যমান ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার সামগ্রিক কোন রূপ নয়। স্বল্প পরিসরে এখানে বিদ্যমান ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে মাত্র। এবিষয়ে আরও ব্যাপক পর্যালোচনা প্রয়োজন।

৬. সুপারিশ সমূহ

ক) পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যে সব বিধিবিধান স্পস্টতই অকার্যকর সে গুলো delete করে আর্থিক আইনকানুন সংক্রান্ত মৌলিক পুস্তকাদির একটি সার্বিক সংকলন প্রস্তুত করা।

খ) প্রয়োগের ক্ষেত্রে ও ব্যয়ের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত আর্থিক বিধি- প্রবিধি ও আইনকানুন সমুহকে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে বিন্যস্ত করার ব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত করা এবং সেই অনুযায়ী বিষয় ভিত্তিক সঙ্কলনে কাজ হাতে নেয়া।

গ) বিষয় ভিত্তিক সঙ্কলনগুলোর সহজ ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করা এবং আকর্ষণীয় ভাবে মুদ্রণের ব্যবস্থা নেয়া।

ঘ) ভবিষ্যতে প্রণীতব্য বিধি–প্রবিধি সমুহকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক সঙ্কলনে সহজে সন্নিবেশিত করার ব্যবস্থা রাখা।

ঙ) যে কোন নতুন আর্থিক বিধিপ্রণয়ন কিংবা প্রচলিত বিধির সংশোধন বা পরিবর্তনের আগে অডিটর জেনারেলের অভিমত নেয়া।

৭. উপসংহার

বাংলাদেশে প্রচলিত আর্থ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধি–প্রবিধি ও আইনকানুন সমুহকে সুশৃঙ্খলভাবে বিষয় ভিত্তিকে বিন্যস্ত করে সঙ্কলিত করা এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী অধিকতর সামঞ্জস্যপুর্ণ করে তোলা সত্যিকার অর্থেই একটি গবেষণা মূলক

কাজ। এর জন্যে একটিদকে যেমন সময় ও অর্থের প্রয়োজন, তেমনি অপরদিকে প্রয়োজন বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত প্রয়াস। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বর্তমান উদ্যোগ নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী। যদি এই উদ্যোগ অনুযায়ী এর নির্দষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাস্তব কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাহলে জাতীয় ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখবে্ একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

বিঃদ্রঃ ১. ২৪-২৯ এপ্রিল, ১৯৯১ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত "দেশে প্রচলিত আইন ও বিধি-প্রবিধি" বিষয়ক সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ।

২. প্রবন্ধটি বিপিএটিসির বুনিয়াদী প্রশিক্ষণে আর্থবিধি মডিউলে পাঠ্য বিষয় হিসেবে ব্যাহৃত হতে পারে।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৌষ ১৪০২

সার্ক ও আসিয়ান

শহীদুল হক

ক। সার্ক/আসিয়ান ঃ সূচনা

মূলত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য সার্ক এবং আসিয়ান গঠন করা হয়। আসিয়ান সার্কের চাইতে সময়ের দিক থেকে পূর্ববর্তী সংগঠন। একটি আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পাঁচটি দেশের (ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর এবং থাইল্যান্ড) রাজনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রী / পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা ১৯৬৭ সনের ৮ই আগষ্ট তারিখে ব্যাংককে একটি ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করেন। এটা ব্যাংকক ঘোষণা নামে পরিচিত। এই ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে ১৯৭৬ সনের ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে আসিয়ান গঠন করা সম্পর্কিত চূড়ান্ত দলিল (Concord) সম্পাদন করা হয়। আলোচ্য পাঁচটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ বালিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এই দলিল স্বাক্ষর করেন। (পরবর্তী সময়ে ব্রুনেই এবং ভিয়েৎনাম আসিয়ানের সদস্য হয়)।

অন্যদিকে সাতটি দক্ষিণ এশীয় দেশের (বাংলাদেশ, ভূটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা) সংগঠন সার্ক আত্মপ্রকাশ করে ১৯৮০- এর দশকে। ১৯৮৩ সনের ২রা আগষ্ট তারিখে নতুন দিল্লীতে এই দেশগুলোর পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা একটি ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করেন। এটা নয়া দিল্লী ঘোষণা নামে পরিচিত। এই ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে সার্কের চূড়ান্ত দলিল রচনা করা হয় এবং ১৯৮৫ সনের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর রাষ্ট্র প্রধানগণ সার্ক গঠন করা সম্পর্কিত চূড়ান্ত দলিলে (Charter) স্বাক্ষর করেন।

খ। সংঘবদ্ধতার পূর্ব–ইতিহাস

সার্ক এবং আসিয়ান উভয় অঞ্চলেই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা আগেও লক্ষ্য করা গেছে। আসিয়ান এলাকাতেই এরকম উদাহরণ বেশি। ১৯৬১ সনের জুলাই মাসে এই এলাকার তিনটি দেশ (মালয়, ফিলিপাইন এবং থাইল্যান্ড) Association of Southeast Asia (দক্ষিণ–পূর্ব এশীয় সংস্থা) গঠন করে। এই সংগঠনটির সমস্যা ছিল এই যে, এর সদস্য সংখ্যা ছিল সীমিত এবং এরকম অভিযোগ ছিল যে, এটা ছিল কমিউনিষ্ট বিরোধী একটি দলের সংগঠন যার উদ্দেশ্য ছিল মূলত রাজনৈতিক। তাছাড়া এই সংস্থার কার্যকারিতা, উত্তর বোর্ণিও এর মালিকানা নিয়ে মালয় এবং ফিলিপাইনের মধ্যকার বিরোধের কারণে বিঘ্নিত হয়।প্রায় একই সময়ে মালয় ,ফিলিপাইন এবং ইন্দোনেশিয়া বৃহত্তর মালয়ী কনফেডারেশন নামে একটি সংস্থা গঠন করে, যেটাকে"Maphilindo" নামেও অভিহিত করা হয়। "Maphilindo" –ও কার্যকর আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারেনি। তাছাড়া এর 'মালয়ী' প্রকৃতির জন্য এই সংগঠনের বিষয়ে এলাকার অন্যান্য দেশও তেমন আগ্রহী হয়ে উঠতে পারেনি।

এক সময় সার্ক এলাকায় সিয়াটো (Southeast Asian Treaty Organization), সেন্টো (Central Treaty organization),আরসিডি (Regional Cooperation for Development) ইত্যাদি সংগঠন দেখতে পাওয়া গেছে এবং পাকিস্তান ছিল মূলত এই সংগঠনগুলোর বিষয়ে আগ্রহী। এই সংগঠনগুলো, বিশেষ করে সিয়াটো এবং সেন্টো ছিল সামরিক–রাজনৈতিক প্রকৃতির। এই এলাকার সবচাইতে বড় প্রভাবশালী দেশ ভারত এইসব সংগঠনের সদস্য ছিল না, বরং এগুলোর সংগে পশ্চিমা পরাশক্তির সম্পর্ক থাকায় এগুলোর বিরোধী ছিল সে। ফলে এইসব সংগঠনের সঠিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল না।

গ। সার্ক আসিয়ান ঃ দেশ/মানুষ

দেশ এবং অর্থনীতির আকারের দিক থেকে আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর মধ্যকার পার্থক্য বড় হলেও সার্কভুক্ত দেশগুলোর মত নয়। ইন্দোনেশিয়ার আয়তন অন্যান্য দেশের চাইতে অনেক বড় কিন্তু অর্থনীতির আকারের দিক থেকে দেশগুলোর ভেতরকার পার্থক্য অতি বিরাট নয়। অন্যদিকে সার্কের বৃহত্তম দেশ ভারতের আয়তন অন্য সকল

দেশের তুলনায় বিশাল, অর্থনীতির আকারও অনেক বড়।এই ব্যবধান সার্ক এলাকায় বৃহত্তম দেশ ভারতের সংগে অন্যান্য দেশের ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করেছে। এটা পরিণতিতে সার্কের সুস্থ ও সুষ্ঠু অগ্রাযাত্রায় সহায়ক হয়নি।

জাতি (race), ধর্ম , ভাষা. সংস্কৃতি, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সার্ক এবং আসিয়ান অঞ্চলের দেশগুলোর ভেতর মিল এবং অমিল দুটোই আছে।আসিয়ান অঞ্চলের দেশগুলোতে মালয়ী, চৈনিক এবং নিগ্রোয়েড জাতির লোক বাস করে, তাদের ভাষা চীনা, তিব্বতীয়, মালয়ী অথবা মালয়ী–পালিনেশীয়। ধর্মের ক্ষেত্রে থাইল্যান্ডে রয়েছে বৌদ্ধ এবং মুসলিম, ফিলিপাইনে খ্রীষ্টান ও মুসলিম, মালয়েশিয়ায় মালয়ী মুসলিম ও চীনা কনফুশীয় তাওবাদে বিশ্বাসী লোকেরা। এইসব পার্থক্যের কারণে এই দেশগুলোর অভ্যন্তরে টানাপোড়েন ছিল, বিবাদ ছিল। যেমন মালয়েশিয়ায় সংখ্যালঘু বংশোদ্ভূতরা সংখ্যায় অনেক বড়, ফলে এদের সংগে সংখ্যাগুরু মালয়ীদের বিবাদ ছিল, এবং দাংগা পর্যন্ত হয়েছে। এইসব অভ্যন্তরীণ পার্থক্যের কারণে এই এলাকার দেশগুলোর ভেতর সম্পর্ক ভালো ছিল না। কিন্তু আসিয়ান দেশগুলো এই বিভেদ ও সংঘর্ষ কালক্রমে সাফল্যের সংগে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। এ প্রসংগে একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, That the differences between the countries are now so often igrnored is a mark of what ASEAN has achieved.[১]

সার্ক এলাকার দেশগুলোর মানুষের একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। এটা একটি বড় সুবিধা, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই এলাকার মানুষের চেতনায় রাজনীতি, ধর্ম এবং ভাষাগত পার্থক্যের বোধ বেশ গভীরে প্রোথিত। ফলে এ এলাকার জাতিগত এবং পারস্পরিক ধর্মীয় বিরোধ দীর্ঘদিন থেকে জারি রয়েছে। এবং দুর্ভাগ্যক্রমে এইসব বিরোধের সঠিক সমাধান সার্ক এলাকার দেশগুলো এখনো করতে পারেনি। ফলে আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য অপরিহার্য , পারস্পরিক বিশ্বাসের আবহ এই এলাকায় এখনো পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়নি।

ঘ) সার্ক/আসিয়ান ঃ সংগঠন কাঠামো

সংগঠনের কাঠামোর দিক দিয়ে সার্কের স্তরের সংখ্যা বেশি।

সার্ক ও আসিয়ানের কাঠামোগত স্তর বিন্যাসের পার্থক্য

	সার্ক	আসিয়ান
শীর্ষ বৈঠক	রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠক। অন্তত বছরে একবার বসে।	নাই। তবে প্রয়োজন হলে এধরনের বৈঠক হতে পারে।
মন্ত্রীদের বৈঠক	পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠক। সাধারণত বছরে দুবার বসে।	নাই
ষ্ট্যান্ডিং কমিটি	পররাষ্ট্র সচিবদের নিয়ে গঠিত। যতবার প্রয়োজন ততবার বৈঠকে বসতে পারে। তবে বছরে সাধারণত দুবার বসবে।	স্বাগতিক দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রদূতদের সমন্বয়ে গঠিত।
স্থায়ী কমিটি	কারিগরি কমিটি নামে অভিহিত। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ১২টি কারিগরি কমিটি আছে।	নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর বিশেষজ্ঞ ও কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি।
সচিবালয়	নেপালে অবস্থিত	ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থিত। (প্রতিটি দেশে একটি করে জাতীয় সচিবালয়ও আছে)।

৬। **উদ্দেশ্যাবলী ঃ**

সার্ক

১. দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের সাধারণ মঙ্গল অর্জনে সহায়তা (Promote) করা এবং তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

২. এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অগ্রগতি এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং সকল ব্যক্তিকে সম্মানের সংগে বাঁচা এবং তাঁদের সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ প্রদান করা।

৩. দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর ভেতর যৌথ-আত্মনির্ভরতার বিষয় উৎসাহিত এবং শক্তিশালী করা।

৪. পারস্পরিক বিশ্বাস এবং একেঅপরের সমস্যা বোঝা ও অনুধাবনের (Understanding and appreciation)ক্ষেত্রে অবদান রাখা।

৫. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সাহায্যের বিষয় উৎসাহিত করা।
৬. অন্যান্য উন্নয়শীল দেশের সংগে সহযোগিতা শক্তিশালী করা।
৭. সকলের সাধারণ (Common)স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আন্তর্জাতিক ফোরামে নিজেদের ভেতরকার সহযোগিতা দৃঢ় করা। এবং
৮. একই ধরনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্বলিত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনসমূহের সংগে সহযোগিতা করা।

সার্ক চার্টার- ২

আসিয়ান

১. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতিসমূহের সমৃদ্ধশালী ও শান্তিপূর্ণ একটি সম্প্রদায় গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দক্ষতা ও অংশীদারিত্বের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অগ্রগতি ও সাংস্কৃতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করা।
২. এই অঞ্চলের দেশসমূহের ভেতর সম্পর্কের ক্ষেত্রে ন্যায় এবং আইনের শাসনের প্রতি সম্মান দেখিয়ে এবং জাতিসংঘের সনদ মেনে চলার মাধ্যমে আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।
৩. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কারিগরি, বৈজ্ঞানিক এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, সক্রিয় সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সাহায্যের বিষয় উৎসাহিত করা।
৪. শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা সুবিধার আকারে পরস্পরকে সাহায্য করা।
৫. কৃষি ও শিল্পের অধিকতর ব্যবহার নিশ্চিত করা, আন্তর্জাতিক পণ্য বাণিজ্যের সমস্যবলী সম্পর্কে সমীক্ষাসহ বাণিজ্যের প্রসার, যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে আরো কার্যকররূপে সহযোগিতা করা।
৬. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিষয়ক পাঠ (Studies) উৎসাহিত করা।
৭. একই ধরনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বলিত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সংগে ঘনিষ্ঠ এবং লাভজনক সম্পর্ক বজায় রাখা এবং নিজেদের ভেতর আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বিষয়ে সকল পন্থার সন্ধান করে দেখা।

চ। সার্ক/আসিয়ানঃ উদ্দেশ্যাবলীর তুলনা

আসিয়ান এবং সার্ক, উভয় সংস্থার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি গোষ্ঠীবদ্ধ সম্পর্ক গড়ে তোলা। কিন্তু এ সম্পর্কিত সার্ক এবং আসিয়ানের দলিল থেকে এই বিষয়টি পরিষ্কাররূপে বুঝতে পারা যায় যে, সার্ক এলাকার দেশগুলোর আত্মবিশ্বাস, আসিয়ান দেশগুলোর চাইতে কম। এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিও দৃঢ় নয়। এ কারণেই সার্কের দলিলে কি কি করা হবে বা বলা হবে কেবলমাত্র তা-ই উল্লেখ করা হয় নাই, একই সংগে এই ফোরামে কি কি বিষয় আলোচনা করা যাবে না তাও সুনির্দিষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। সার্কের দলিলে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে দেয়া হয়েছে, (১) সার্কের সর্বস্তরে সর্বসম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, এবং (২) আলোচ্যসূচি থেকে দ্বিপক্ষীয় এবং বিতর্কিত বিষয়সমূহ বাদ যাবে। সার্কের দলিলে এ ধরনের ব্যবস্থা রাখাটা পারস্পরিক ভয় এবং সন্দেহের বহিঃপ্রকাশ। এবং এই উভয় ব্যবস্থা দলিলে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে সবচাইতে বড় দেশ ভারতের অবদান ছিল সবচাইতে বেশি। সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার পিছনে কাজ করছে ভারতের এই ভয় যে, তার (ভারতের) প্রতিবেশী ক্ষুদ্র দেশগুলো তার বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়ে এই ফোরামে তাকে বিব্রত/বিপদগ্রস্থ করতে পারে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের (Pran Chopra) মতে, ছোট দেশগুলোরও ভয় ছিল যে, ভারত এই ফোরামে তার প্রভাবের দ্বারা ভোট নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ৪। এ ধরনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়ে আসিয়ানের দলিলে কিছু বলা নাই এবং এটা আসিয়ান দেশগুলোর পারস্পরিক বিশ্বাসের পরিমাণ প্রকাশ করে। তাদের ভেতর নিশ্চয়ই এই ভীতি কাজ করে নাই যে, এ ধরনের কোন কথা লেখা না থাকলে তাদের কারও ওপর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে কিছু চাপিয়ে দেয়ার সম্ভাবনা আছে। এখানেই সার্ক এবং আসিয়ানের অবস্থার পার্থক্য, Mutual mistrust, arising mostly out of deep seated hatred for each other abounds in South Asia. ASEAN has passed that phase and mutual confidence and political will pevail in ASEAN.৫

আঞ্চলিক প্রতিবেশী দেশগুলোর সংগে বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় এবং বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে ভারত খুবই স্পর্শকাতর। ভারত হচ্ছে একমাত্র দেশ যার সংগে অন্য প্রায় সবগুলো দেশের সাধারণ সীমানা রয়েছে, অন্য কোন দেশের এরকম নাই। এবং ভারতের প্রতিবেশীদের সংগে ভারতের সমস্যাও রয়েছে। ভারত কখনই চায় না এই

সমস্যাগুলোকে বহুপক্ষীয়, আন্তর্জাতিক অথবা আঞ্চলিক করে তুলতে। এমনকি, যে সমস্যার দ্বিপক্ষীয় সমাধান সম্ভব নয়, যেমন বাংলাদেশের বন্যা বা গঙ্গার পানিপ্রবাহ বৃদ্ধি , সেই বিষয়গুলোও বহুপক্ষীয় বা আঞ্চলিক করে তুলতে ভারত সম্মত নয়। ভারত যেকোন কারণেই হোক তার প্রতিবেশীদের সংগে দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে বোঝাপড়া করতেই পছন্দ করে। সার্কের চার্টারে লিপিবদ্ধ বিতর্কিত বিয়ষ আলোচনা না করার এই ব্যবস্থাকে অনেকে "escape clause" হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং সার্কের কার্যকর হতে না পারার পেছনে অন্যতম কারণ হিসেবে সনাক্ত করেছেন ৬। অন্যদিকে আসিয়ানের দলিলে ধরনের কিছু নেই। বরং আসিয়ানের Concord-এ রাজনৈতিক চরিত্র সম্বলিত বিষয় সম্পর্কে কার্যপরিকল্পনার উল্লেখ রয়েছে এবং এতে এক জায়গায়, এই অঞ্চলের অন্তর্গত বিরোধসমূহের যত শীঘ্র সম্ভব শান্তিপূর্ণ সমাধানের কথা বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর মনোভাব অনেক পরিণত এবং একটি আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠান গঠনের অনুকূল।

ছ। সংগঠনের বিকাশ/সাফল্য/ব্যর্থতা

এ কথা সতর্কতার সংগে বলা যায় যে, আসিয়ান এবং সার্ক, দুটি সংস্থার গঠনের পিছনেই হয়তো এক ধরনের ভয়ের প্রসঙ্গ কাজ করেছিল, আসিয়ানের ক্ষেত্রে ভয়টি ছিল বাইরের, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সার্কের ক্ষেত্রে তা ছিল ভেতরের।আসিয়ান দেশগুলো কমিউনিষ্ট দেশগুলোর, বিশেষ করে চীনের বিষয়ে চিন্তিত ছিল এবং এর সংগে অন্যান্য বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে ১৯৬৭ সনে তারা ব্যাংকক ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করে। কিন্তু তারপরে তাদের সাংগঠনিক অগ্রগতি প্রায় থেমে থাকে সত্তর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। কিন্তু ১৯৭৫ সনে ইন্দোচীনে কমিউনিষ্টদের বিজয়ের পর আসিয়ানের সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। তারা প্রায় নয় বছর পর চূড়ান্ত দলিল (Concord) স্বাক্ষর করে তার এক বছরের ভেতর ১৯৭৭ সনে Preferential Trading Arrangements (PTA) নামক দলিলে স্বাক্ষর করে।

অন্যদিকে সার্ক গঠনের মূল উদ্যোগ নেয় ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বাংলাদেশ, এবং তখন সার্কের সকল ক্ষুদ্র রাষ্ট্রেরই ভারতকে একটি আঞ্চলিক সহযোগিতার কাঠামোর ভেতর নিয়ে আসার ইচ্ছে হয়তো কাজ করেছিল, কারণ দ্বিপাক্ষিক কারণে এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর ভারত সম্পর্কে ভয় থাকা অসম্ভব নয়। ১৯৮০সনে, একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠন করা সম্পর্কে বাংলাদেশ যে প্রস্তাব করে তাতে এই ভয়ের (apprehension) প্রসংগটি পরিষ্কাররূপেই প্রকাশ পেয়েছিল, এতে বলা হয়, in South Asia as in other region of the world, we have countries at different levels of

development, some are relatively less developed than others. Any proposal for economic cooperation must consequently be formulated with the greatest care in order to ensure that the weak are not exploited and the strong do not dominate. অন্যদিকে এই অঞ্চলের ছোট দেশগুলোর আর্থ–রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের আধিপত্যের ভয় দূর করার বিষয়ে ভারতও খুব বেশি আগ্রহী হয় নাই। ফলে সার্কের অগ্রগতি এখনো আশাব্যঞ্জক নয়। ১৯৮৩ সনে নতুন দিল্লী ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করার পর ১৯৮৫ সনে Charter স্বাক্ষর করা হয়, কিন্তু প্রকৃত অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য একটি চুক্তি (SAPTA) স্বাক্ষর করতে সার্ক দেশগুলোর প্রায় ৮ বৎসর লেগে যায়। ১১ই এপ্রিল ১৯৯৩ তারিখে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তারপর প্রায় দু বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ৮ই ডিসেম্বর ১৯৯৫ থেকে এটা কার্যকর হয়।

সার্ক এলাকায় উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে এবং দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার বেশ কিছু যথার্থ ক্ষেত্রও আছে। পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য কৃষি, যোগাযোগ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রম, আবহাওয়া বিজ্ঞান, মাদকদ্রব্যের পাচার ও অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, পল্লী উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পর্যটন, পরিবহণ, উন্নয়নে নারী ইত্যাদি ১২টি ক্ষেত্র সনাক্ত করা হয়। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে কার্যকর সহযোগিতার পরিমাণ খুব বেশি নয়। এখনো পর্যন্ত সার্কের কর্মকান্ড অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, শিক্ষা সফর বিনিময়, কর্মশালা/ সেমিনার অনুষ্ঠান, ইত্যাদির ভেতর সীমাবদ্ধ রয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক/ সহযোগিতার পরিমাণ আসিয়ান দেশগুলোর তুলনায় সার্ক এলাকায় খুবই সামান্য। সার্ক এলাকার দেশগুলো নিজেদের ভেতর যে বাণিজ্য করে তার পরিমাণ তাদের মোট বাণিজ্যের তুলনায় নগণ্য। তাছাড়া এই বাণিজ্যের প্রকৃতিও ভারসাম্যহীন। ভারতের সংগে তার প্রায় সকল প্রতিবেশী দেশরই বাণিজ্যিক ঘাটতি রয়েছে। পারস্পরিক বাণিজ্যিক সম্পর্কের নগণ্যতার কথা SAPTA চুক্তিতে স্বীকার করে বলা হয়েছে যে, দক্ষিণ এশিয়ার মোট বাণিজ্যের পরিমানের তুলনায় এই এলাকার দেশগুলোর পারস্পরিক বাণিজ্যের পরিমাণ সামন্য, এবং SAPTA-র উদ্দেশ্য এই অবস্থার প্রতিবিধান করা।

কিন্তু SAPTA এবং ASEAN-PTA দলিল পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, আসিয়ান দলিলটির তুলনায় SAPTA, কার্যপরিধির বিচারে অনেক সংকীর্ণ। SAPTA দলিলে বলা হয়েছে, SAPTA may, inter alia, consist of arrangements relating to (a) tariffs; (b) para-tariffs; (c) non-traiff measures; (d) direct trade measures, অন্য দিকে ASEAN-PTA দলিলে সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে Tariff এর

প্রসংগ ছাড়াও longterm quantity contracts, purchase finance support, preference in government procurement, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতার কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছ। SAPTA এবং ASEAN-PTA এর মধ্যকার সবচাইতে বড় পার্থক্য হচ্ছে, SAPTA দলিলে দেশগুলোর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ককে, ক্ষেত্র বিশেষে, এই চুক্তির ওপরে স্থান দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই ব্যবস্থাটি পুনরায় প্রমাণ করেছে যে, সার্ক এলাকার দেশগুলোর পারস্পরিক সহানুভুতির পরিমাণ আসিয়ান এলাকার দেশগুলোর চাইতে কম। উভয় বাণিজ্য দলিলের সংশ্লিষ্ট অংশ এরকমঃ

SAPTA (Article-11)... this Agreement shall not apply in relation to preferences already granted or to be granted by any Contracting State to other Contracting States outside the framework of this Agreement, and to third countries through bilateral, plurilateral and multilateral trade agreements, and similar arrangements. The Contracting States shall also not be obliged to grant preferences in SAPTA which impair the concession extended under those agreements.

ASEAN-PTA (Article-8(2) Where tariff preferences have been negotiated on multilateral or bilateral basis, the concession so agreed should be extended to all Contracting States on an ASEAN most favoured nation basis.

ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায় (EEC) এর মত সংস্থার তুলনায় আসিয়ান এবং সার্ক উভয়ই নবীন সংস্থা (সার্ক নবীনতর) । কিন্তু মানসিক প্রবণতার বিচারে সার্কভুক্ত দেশগুলোর চাইতে আসিয়ান দেশগুলোর মনোভাব অনেক সুস্থ এবং পরিণত। বহুপক্ষীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতার উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করার মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় রাজনৈতিক সম্পর্কের উন্নয়ন ক্রামান্বয়ে অর্জন করা সম্ভব, না, দ্বিপক্ষীয় বিবাদের সমাধানের মাধ্যমেই কেবল আঞ্চলিক আর্থসামাজিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব, এ বিতর্ক অর্থহীন, কারণ এর শেষ নেই। তবে এখনো পর্যন্ত এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, Contentious issues আলোচনার বাইরে রেখে সার্কের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়নি। অনেকের মতে সার্কের মত একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়, তার তুলনায় এর সাফল্য সামান্য। ব্যয় ও উপযোগিতার বিচারে সার্ক এখানো পর্যন্ত আকর্ষণীয় প্রমাণিত হয়নি এবং এসব কারণে এই এলাকার দেশগুলো যদি মনে করতে থাকে যে, তারা এই শ্বেত হস্তির বোঝা আর বহন করতে সক্ষম নয় তবে তাদের হয়তো দোষ যাবে না। ৭

উপসংহার

সার্ক এবং আসিয়ানের মধ্যে তুলনায় গেলে সার্কের বিষয়ে হতাশা প্রবলভাবে জেগে ওঠে। ঐতিহাসিক কারণেই এই এলাকার আর্থসামাজিক কাঠামোর ভেতর পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং সহানুভূতির অভাব রয়েছে। বিভিন্ন কারণে এই দূরত্ব এখনো ঘোচেনি। ভারতের বিষয়ে ছোট দেশগুলোর প্রকৃত ভয়ের সংগে কাল্পনিক ভয় যুক্ত হয়নি এমন কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। অন্যদিকে ভারত তার প্রতিবেশীদের অতিরিক্ত ভারত ভীতিকে ভারত বিরোধিতা হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের প্রকৃত ভয়ের কারণগুলো দূর করার বিষয়েও অগ্রসর হয়নি।

তৃতীয়বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংগঠন বিশেষ সহায়ক হতে পারে। সার্কের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। তবে সার্কের দেশগুলোর অন্তর্গত সমস্যার কারণে বলা হয়েছে যে, "such cooperation can only succeed when there is a convergence of national psyche of all states of South Asia" ।৮ তবে এই বিষয়টি কবে সম্ভব হবে এবং আদৌ সম্ভব হবে কি না,তা এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট করে বলতে পারার উপায় নাই; কিন্তু সার্ক খুব দ্রুত (অনেকে যেমন মনে করেন) ভেংগে নাও যেতে পারে। সার্ক দেশগুলোর ভেতরে যে টানাপোড়েন রয়েছে অনেক এলাকার দেশের ভেতরেই তেমন ছিল, কালক্রমে তারা তা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। সার্কের ক্ষেত্রেও সেটা সম্ভব হতে পারে। বিচ্ছিন্নতা, বিদ্বেষ এবং ঘৃণাকে স্থায়ী করে তোলে, পারস্পরিক অবিশ্বাস কাটিয়ে ওঠার সব চাইতে বড় উপায় হচ্ছে পারস্পরিক যোগাযোগের রাস্তা উন্মুক্ত রাখা। এবং অন্য কোন উপযোগিতা আপাতত তেমন দেখা না গেলেও ফোরাম হিসেবে সার্ক একটি সুযোগ প্রদান করেছে পরস্পর মিলিত হওয়ার।৯ ❑

❑ এই প্রবন্ধ পিএটিসির বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে একই বিষয়ের পাঠ সহায়ক হিসেবে ব্যবহারযোগ্য।

উপসংহার

সার্ক এবং আসিয়ানের মধ্যে তুলনায় গেলে সার্কের বিষয়ে হতাশা প্রবলভাবে জেগে ওঠে। ঐতিহাসিক কারণেই এই এলাকার আর্থসামাজিক কাঠামোর ভেতর পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং সহানুভূতির অভাব রয়েছে। বিভিন্ন কারণে এই দূরত্ব এখনো ঘোচেনি। ভারতের বিষয়ে ছোট দেশগুলোর প্রকৃত ভয়ের সংগে কাল্পনিক ভয় যুক্ত হয়নি এমন কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। অন্যদিকে ভারত তার প্রতিবেশীদের অতিরিক্ত ভারত ভীতিকে ভারত বিরোধিতা হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের প্রকৃত ভয়ের কারণগুলো দূর করার বিষয়েও অগ্রসর হয়নি।

তৃতীয়বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংগঠন বিশেষ সহায়ক হতে পারে। সার্কের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। তবে সার্কের দেশগুলোর অন্তর্গত সমস্যার কারণে বলা হয়েছে যে, "such cooperation can only succeed when there is a convergence of national psyche of all states of South Asia"। ৮ তবে এই বিষয়টি কবে সম্ভব হবে এবং আদৌ সম্ভব হবে কি না,তা এই মুহূর্তে নিদিষ্ট করে বলতে পারার উপায় নাই; কিন্তু সার্ক খুব দ্রুত (অনেকে যেমন মনে করেন) ভেংগে নাও যেতে পারে। সার্ক দেশগুলোর ভেতরে যে টানাপোড়েন রয়েছে অনেক এলাকার দেশের ভেতরেই তেমন ছিল, কালক্রমে তারা তা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। সার্কের ক্ষেত্রেও সেটা সম্ভব হতে পারে। বিচ্ছিন্নতা, বিদ্বেষ এবং ঘৃণাকে স্থায়ী করে তোলে, পারস্পরিক অবিশ্বাস কাটিয়ে ওঠার সব চাইতে বড় উপায় হচ্ছে পারস্পরিক যোগাযোগের রাস্তা উন্মুক্ত রাখা। এবং অন্য কোন উপযোগিতা আপাতত তেমন দেখা না গেলেও ফোরাম হিসেবে সার্ক একটি সুযোগ প্রদান করেছে পরস্পর মিলিত হওয়ার।৯ ❑

❑ এই প্রবন্ধ পিএটিসির বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে একই বিষয়ের পাঠ সহায়ক হিসেবে ব্যবহারযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Ping, Ho kwon, ASEAN : The Five countries; in Alison Broinowski edited Understanding ASEAN, The Macmillan Press Ltd, 1983, P. 196.
2. SAARC in fried, a SAARC Secretariat Publication, 1974.
3. Bangkok declaration; in Alison Broinowski, Opcit, Appendix-A.

4. Chopra, Pran,SAARC and ASEAN : Comparative Anaysis of Structures and Aims: in Bhabani Sengupta edited SAARC-ASEAN: Prospects and Problems of Inter regional cooperation, South Asian Publishers, New Delli, 1988, P.10.

5. Rahman, Atiur, Political Economy of Inter-regional cooperation: The SAARC and ASEAN Experience, in Bhabani Sengupta, 1bid, P. 117.
6. Halim, Md. Abdul, Wither Away the white Elephant Called SAARC?
7. I bid.
8. Rahman, Atiur, Opcit P. 119.
9. Ibid, P. 117.

নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা

কাজী মোঃ শামসুল আলম

ভূমিকাঃ পৃথিবীকে অধিকতর শান্তিময়, সুন্দর ও বাসযোগ্য করে তোলার আকাঙ্খা মানুষের চিরকালের। এ আকাঙ্খা থেকেই মানুষ স্বপ্ন দেখেছে, সংগ্রাম করেছে।বর্তমান শতাব্দীতে এক্ষেত্রে মানুষের সবচেয়ে বড় পদক্ষেপটি হলো জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা। এর মাধ্যমে তৎকালীন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ পুরনো বিশ্ব ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই স্নায়ুযুদ্ধের বিস্তার নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে অংকুরেই বিনষ্ট করে। বর্তমান দশকে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার ধারণাকে পুনরুজ্জীবিত করেছে।

জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর বিজয়ী মিত্রশক্তি ১৯৪৫ সনে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করে।জাতিসংঘ সনদের প্রথম আর্টিকেলে ঘোষণা করা হয়, জাতিসংঘের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজার রাখা। জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং জাতিসমূহের সমানাধিকারের ভিত্তিতে জাতিসমূহের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নয়ন। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা মানবিক সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিস্তার ঘটানো। জাতিসংঘ সনদের দুই নম্বর আর্টিকেলে বলা হয়েছে, জাতিসংঘ জাতিসমূহের সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত । সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মাঝে সৃষ্ট সকল বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিস্পত্তি করতে হবে। সদস্য রাষ্ট্রসমূহ প্রতিশ্রুতি দেয়, তারা জাতিসংঘের আদর্শের পরিপন্থীরূপে শক্তি ব্যবহার করবে না অথবা শক্তি ব্যবহারের হুমকি দেবে না।[১]

জাতিসংঘের মাধ্যমে নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অচিরেই বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গের পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভেস্তে যায়।বিজয়ী মিত্রশক্তি মার্কিন ও সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন দুটি ব্লকে বিভক্ত হয়ে পরস্পর স্নায়ুযুদ্ধে লিপ্ত হয়।

---

[১] The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 29. PP. 142-143.

স্নায়ুযুদ্ধঃ লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি-র অমর সৃষ্টি মোনালিসা-র হাসির মতই স্নায়ুযুদ্ধ বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন অর্থ বহন করে। এটা ছিল বিশ্বের দুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্তি। এটা ছিল ইউরোপের এবং সুনির্দিষ্টভাবে জার্মানীর দুটি পরস্পর বিরোধী প্রভাব বলয়ের অন্তর্ভুক্তি। এটা ছিল আদর্শগত সংঘাত, কারো কারো মতে পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের মাঝে, অন্যদের মতে গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের মাঝে। এটা ছিল তৃতীয় বিশ্বের আনুগত্য লাভ এবং তার উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এটা ছিল পর্দার অন্তরালে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর বুদ্ধির লড়াই। এটা ছিল এমন এক সংগ্রাম যা সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ এবং ইতিহাসকে পরিবর্তিত করেছিল। এটা ছিল এমন এক অস্ত্র প্রতিযোগিতা যা বিশ্বসভ্যতাকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। কোরিয়া যুদ্ধ, কিউবা ক্ষেপণাস্ত্র সংকট এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধ স্নায়ুযুদ্ধকে বিশ্বের সামনে প্রকটভাবে উপস্থাপিত করে। ১৯৯০ সনে জার্মানীর একীকরণের মাঝ দিয়ে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে। ১৯৯০ সনের নভেম্বরে প্যারিসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন, "স্নায়ুযুদ্ধের অবসান হয়েছে।" ১৯৯১ সনে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি নিকট ভবিষ্যতে স্নায়ুযুদ্ধের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনাকে দূরীভূত করেছে।

নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার ধারণাঃ স্নায়ুযুদ্ধের অবসান নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার ধারণাকে সামনে নিয়ে এসেছে। নব্বইয়ের দশকে নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার সবচেয়ে খ্যাতনামা প্রবক্তা হচ্ছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ। তাঁর ধারণায় নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে জাতিসমূহের সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক আইনের শাসন বজায় রাখা। এর মাধ্যমেই বুশ প্রশাসন আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্য অর্জন করতে চেয়েছে। উপসাগরীয় যুদ্ধকেও বুশ প্রশাসন নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছে। সাদ্দাম হোসেনকে নব্য হিটলার আখ্যায়িত করে বুশ বলেন, ইরাকের কুয়েত দখলের জোরালো ও আপোষহীন জবাব দেয়ার মাধ্যমেই কেবল ভবিষ্যতের আগ্রাসী শক্তিসমূহকে নিবৃত্ত করা যেতে পারে। বুশ প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যুক্তরাষ্ট্রকেই বিশ্বে সমষ্টিগত নিরাপত্তা রক্ষায় নেতৃত্ব দিতে হবে।[২]

অপরদিকে কিছু সংখ্যক সাংবাদিক এবং পন্ডিতদের মত অনুযায়ী নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হবে বিশ্বের সকল দেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্রায়ন। গণতন্ত্রায়ণ পন্থীরা বিশ্বের অবশিষ্ট কমুনিষ্ট শাসিত দেশগুলো, একনায়ক শাসিত দেশগুলো এবং রাজা শাসিত

---

[২] Ted Galen Carpenter, 'The New World Disorder', Foreign Policy, Fall, P. 25.

দেশগুলোর দ্রুত গণতন্ত্রায়নের উপরই সবার্ধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এর আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য অনেক কম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। নয়া বিশ্ব ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে যদিও আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা পন্থী এবং বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রায়নের সমর্থকদের মাঝে নীরব আঁতাত লক্ষ্য যায়, এ আঁতাত দীর্ঘস্থায়ী হবে এমনটা আশা করা যায় না।কারণ লক্ষ্য দুটি পরস্পর বিরোধী। ৩

আশি ও নব্বইয়ের দশকের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামরিক শক্তি, বিশাল আয়তন ও বিপুল জনসংখ্যার কারণে চীনের বিশ্ব রাজনীতিতে ক্রমেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। কারো কারো মতে চীন আগামী শতাব্দীতে বিশ্বে দ্বিতীয় পরাশক্তিরূপে আবির্ভূত হবে। নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা চীনের প্রতি তিনটি চ্যালেঞ্জের জন্ম দিয়েছে ঃ

১) পারমাণবিক অস্ত্রের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়া,
২) সামরিক শক্তির চেয়ে অর্থনৈতিক শক্তির অধিকতর গুরুত্ব লাভ এবং
৩) মার্কিন-সোভিয়েত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চীনের কৌশলগত সুবিধার বিলুপ্তি।

নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার মার্কিন ধারণার প্রতিক্রিয়ায় চীন এ সম্পর্কে তার ধারণা প্রকাশ করেছে। চীনের সংজ্ঞায় তিনটি বিষয় মুখ্যঃ

১) বিশ্বের সকল দেশ, ছোট অথবা বড়, সমমর্যাদা সম্পন্ন। কোন দেশ অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।
২) বিশ্ব রাজনীতিতে একটি মাত্র দেশের ক্ষমতার একাধিপত্য রোধ করতে হবে। জাতিসমূহ সম্মিলিত ভাবে ক্ষমতা ভোগ করবে এবং জাতিসংঘ এক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবে।
৩) নয়া বিশ্ব ব্যবস্থায় নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও (New International Economic Order) অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে, যাতে উন্নত দেশগুলো উন্নয়নগামী দেশগুলোকে তাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সহায়তা করবে।[৪]

---

[৩] Ibid, P. 26.

[৪] James C Hsiung, 'China's Omni-Directional Diplomacy : Realignment to cope with Monopolar U. S. Power,' Asian Survey, Vol. XXXV, NO. 6. June 1995, PP 574-575.

চীনের দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্যের বাইরের অনেক দেশেরই সমর্থন পেয়েছে। কারণ প্রাচ্যের দরিদ্র ও উন্নয়নশীল অনেক রাষ্ট্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পাশ্চাত্যের নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার ধারণাকে তাদের স্বার্থ ও মূল্যবোধের প্রতি হুমকি গণ্য করে। তাদের বিশ্বাস নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার ধারণাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে পাশ্চাত্য নিজ স্বার্থ রক্ষায় তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে এবং তাদের উপর নিজস্ব মূল্যবোধ চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে। যা তাদের সামাজিক সুস্থিতি ও ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে। তাছাড়া তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থও এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাকে পাশ্চাত্য তার নিজ আধিপত্য বজায় রাখা, স্বার্থ রক্ষা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ বিস্তারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছে। এসব সংস্থার কার্যক্রম প্রাচ্যের দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থের অনুকূল হয়নি। নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার ধারণাকেও একইভাবে তাদের স্বার্থের পরিপন্থিরূপে ব্যবহার করা হতে পারে এ আশংকার জন্য তাদের দোষী করা যায় না।

উপসংহার ঃ আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা পন্থীদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিশ্বের সকল রাষ্ট্র যদি তাদের বিবাদ সামরিক শক্তি ব্যবহারের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিষ্পত্তি করে তাহলে বিশ্ব মানব বসবাসের জন্য অধিকতর উপযুক্ত স্থান হয়ে উঠবে। একই রকমভাবে বিশ্বের অবশিষ্ট কমুনিষ্ট সরকার, সামরিক একনায়ক, একদলীয় রাষ্ট্র এবং সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারগুলোর জায়গায় যদি নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে পৃথিবী তুলনামূলকভাবে অনেক ভাল জায়গা হবে। তবে এ ধরনের ইউটোপিয়া (Utopia) বাস্তবায়ন সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হলেও তার জন্য কত মূল্য দিতে হবে, সেটাই ভেবে দেখার বিষয়। কারণ নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা অথবা বিশ্বের গণতন্ত্রায়নের মুখরোচক বুলির আড়ালে বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর অপ উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহৎ শক্তিগুলোর অতীত কার্যকলাপ আমাদের সেসব আশংকাকেই জোরদার করে। ১৯৫৩ সনে সিআইএ পরিচালিত অভ্যুথানে ইরানের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মোসাদ্দেকের উৎখাত, ১৯৫৪ সনে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত অভ্যুথানে গুয়াতেমালার নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতাচ্যুতি, সত্তরের দশকে আলেন্দের নেতৃত্বাধীন চিলির নির্বাচিত সরকারকে উৎখাতে যুক্তরাষ্টের প্রচেষ্টা, গণতন্ত্র এবং জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রতি যুক্তরাষ্টের আন্তরিকতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেনা। তাছাড়া স্বাধীনতার প্রতি ভালবাসার জন্য যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চয়ই তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন স্বৈরশাসক যেমন, ইরানের শাহ, নিকারাগুয়ার সমোজা, দক্ষিণ কোরিয়ার পার্ক চুংহি এবং ফিলিপাইনের ফার্ডিন্যান্ড মার্কোসকে সমর্থন করেনি। এসবের পেছনে যুক্তরাষ্টের অর্থনৈতিক বা কৌশলগত স্বার্থ জড়িত ছিল। সরকারীভাবে এসবের পেছনে

যে উদ্দেশ্যগুলো দেখানো হয়েছিল তা ছিল নেহায়েতই প্রচারণা। তাই নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার মার্কিন ধারণা বা প্রচারণায় আমাদের উৎফুল্ল হবার তেমন কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না।

বিঃ দ্রঃ প্রবন্ধটি বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের 'বাংলাদেশ চর্চা' মডিউলের পাঠ্য বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Samuel P. Huntington, `The clash of civilizations?' Foreign Affairs', Summer, 1993.
2. Robert kagan,`The case for Global Activisim', Commentary, Vol. 98, Number Three, September 1994.
3. Francis Fukuyama, `Against the New Pessimism', Commentary, Vol. 97, Number Two, February 1994.
4. Mahathir Mohamad, 'Bosnia and the West,' the 5th column, FAR EASTERN ECONOMIC REVIEW, September 7, 1995.

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৌষ ১৪০২

জাতীয় জীবনে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব

আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান

১.০ প্রারম্ভ

বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। বিশ্বের আর কোন জাতি বা দেশ তার মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বুকের তাজা রক্তে রাজপথ শীতল করেছে এমন দৃষ্টান্ত প্রায় নেই বললেই চলে। এদেশের চিরঞ্জীব সন্তান সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, সফিউর সহ নাম না জানা অনেকের শোণিত ধারায় বাংলা ভাষা চির-ভাস্বর হয়ে আছে। তাই বায়ান্নো সালের মহান ২১ শে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলন এদেশের ইতিহাসে রেখেছে অম্লান স্বাক্ষর, সূচনা করেছে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রবহমান ঐতিহ্য।

২.০ ভাষা আন্দোলনের পটভূমি

ভাষা আন্দোলনের প্রভাব আলোচনার পূর্বে এর একটি সংক্ষিপ্ত পটভূমি তুলে ধরা প্রয়োজন। ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন কর্তৃক 'মাউন্ট ব্যাটেন রোয়েদাদ' ঘোষিত হলে সকলে উপলব্ধি করে যে, ভারতবর্ষ দ্বি-খন্ডিত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্র জন্ম নিতে যাচ্ছে। ভারত তার রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে হিন্দিকে গ্রহণ করার আয়োজন করে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে তখন জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হয়।

এ সময়ে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ জিয়াউদ্দীন আহমদ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দ্দুর নাম প্রস্তাব করলে উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত ভাষাবিদ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'আজাদ' পত্রিকায় (২৯শে জুলাই, ১৯৪৭) 'পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা' শীর্ষক এক প্রবন্ধের মাধ্যমে তার তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করার অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর 'তমুদ্দুন মজলিস' নামক একটি সংগঠন 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দ্দু' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচার করে। এই

পুস্তিকায় অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন ও অধ্যাপক আবুল কাসেম বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী তোলেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে বাংলা ভাষার দাবী উপেক্ষিত হয় এবং সকল প্রকার দলিল, ফরম ও মুদ্রায় ইংরেজী ও উর্দ্দু ভাষা ব্যবহৃত হতে থাকে।

৩.০ ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তমুদ্দুন মজলিসের নুরুল হক ভুঁইয়াকে আহ্বায়ক মনোনীত করে একটি 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়। কিন্তু এই কমিটি তেমন কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। তার ফলে ১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ শেরেবাংলা ফজলুল হক হলে একটি সর্বদলীয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন তমুদ্দুন মজলিসের শামসুল আলম। এই পরিষদের উদ্যোগে ১১ই মার্চ তারিখে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা' দাবী দিবস পালন এবং ১৪ই মার্চ তারিখে পূর্ব পাকিস্তান ব্যাপী বাংলা ভাষার দাবীতে প্রতিবাদ ও হরতাল পালিত হয়। ঠিক ৬ দিন পর ২১শে মার্চ তারিখে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন যে, "উর্দ্দু এবং কেবল উর্দ্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা"। তিনি পুনরায় ঢাকাস্থ কার্জন হলের এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ২৪ শে মার্চ তারিখে একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন। দুটি স্থানে বক্তব্য পেশকালেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র 'না' ধ্বনি দ্বারা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। সেদিনের 'না' সূচক ধ্বনিটি ক্রম–পুঞ্জিতভাবে তীব্রতর হয়ে ১৯৫২ সালে ঘটায় মহান ভাষা আন্দোলন।

১৯৪৮ সাল ব্যাপি 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' কর্তৃক আর তেমন কোন জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি । এর প্রধান কারণ দুটি। প্রথমত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের গঠনে বিভিন্ন মতাবলম্বী ছাত্র নেতাদের সমাবেশ ঘটেছিল, যাদের চিন্তা – চেতনা ও আন্দোলনের ধারা নির্ণয়ে মতদ্বৈধতা ক্রমেই তীব্র হয়ে ওঠে এবং এক পর্যায়ে কমিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে পদত্যাগের ঘটনা ঘটে। দ্বিতীয়ত পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রীসভা ছাত্রদের বাংলা ভাষার দাবী মেনে নেয় এবং পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে সর্বসম্মতি ক্রমে বাংলাকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করে। মন্ত্রীসভা কেন্দ্রে এ বিষয়ে প্রচেষ্টা চালাবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, যা পরবর্তিকালে কার্যকর হয়নি। ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকা আগমন করলে ডাকসু

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ) নেতৃবৃন্দ বাংলা ভাষার দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি তাঁর নিকট পেশ করেন । কিন্তু প্রধানমন্ত্রীও এ বিষয়ে কেন্দ্রে কোন ফলপ্রসূ ভুমিকা পালন করেননি।

১৯৪৯ সালে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বলতে গেলে কোন আন্দোলনই গড়ে তুলতে পারেনি। এ সময়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান আরবী হরফে বাংলা লেখার সুপারিশ পেশ করতে থাকেন। কিছু সংখ্যক বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী এবং মুসলিম লীগের সাংসদবৃন্দ তাঁকে সমর্থন জোগাতে থাকেন। এসময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন ভাষাণী–শামসুল হকের নেতৃত্বে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে পূর্ব পাকিস্তানে একটি সুসংগঠিত বিরোধী দলের আত্মপ্রকাশ। মুসলিম লীগের প্রচণ্ড দাপটের কারণে ঢাকা শহরে কোথাও কোন হল, হোটেল বা বাড়ী এই বিরোধী দল গঠনে ভাড়া পাওয়া সম্ভব হয়নি । অত্যন্ত সঙ্গোপণে কে, এম, দাস লেনের জনাব কে এম, বশীরের নিজস্ব বাসভবন 'রোজ গার্ডেন ' এ দু'দিন ব্যাপী সম্মেলনের মাধ্যমে দলটি অত্মপ্রকাশ করে।

১৯৫০ সালে পুনরায় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্টভাষা সংগ্রাম পরিষদ ' গঠিত হয় ১১ই মার্চে এবং ঐ দিনটিকে ১৯৪৮ সাল স্মরণে উদ্‌যাপন করা হয়। জনাব আব্দুল মতিন এই পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন। এই পরিষদ আন্দোলন পরিচালনার জন্য তহবিল সংগ্রহ , ইস্তাহার বিতরণ, পোষ্টার লাগানো, সভা–সমিতির আয়োজন এবং ছোট খাটো মিছিলের মাধ্যমে বাংলা ভাষার আন্দোলনকে জিইয়ে রাখে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৫০ সাল পর্যন্ত দেশ জোড়া অর্থনৈতিক মন্দা এবং লাগাতার ক্ষুদ্র পরিসরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে বাংলা ভাষার আন্দোলন তেমন কার্যকর হতে পারেনি। প্রকৃত পক্ষে বলা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই ভাষা আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল এবং সারাদেশে মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর লেখনী ও বক্তৃতার মধ্যে এর গণ্ডী নিবদ্ধ থেকে যায়।

এ সময়কার একটি স্মরণীয় ঘটনা এই যে ,ঐ সময়ে উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, বহু–ভাষাবিদ ও রসস্রষ্টা সাহিত্যক সৈয়দ মুজতবা আলী (তৎকালীন বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ) 'চতুরঙ্গ ' পত্রিকায় 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্টভাষা' শীর্ষক এক নিবন্ধে শাসক গোষ্ঠীর প্রতি বলিষ্ঠ হুশিয়ারী উচ্চারণসহ সার্থক ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন " আজ যদি জোর করে পোপের ভ্রান্তাদর্শ অনুসরণ করে উর্দ্দুওয়ালারা পূর্ব পাকিস্তানের স্কনেধ উর্দ্দু চাপান, তবে লুথারের মত লোক পূর্ব পাকিস্তানে খাড়া হবেন। যাঁরা অখন্ড পাকিস্তান চান তাঁরা এই কথাটি ভেবে দেখবেন।

... পূর্ব পাকিস্তানের অনিচ্ছা সত্বেও যদি তার ঘাড়ে উর্দ্দু চাপানো হয়, হবে স্বভাবতঃই উর্দ্দু ভাষাভাষী বহু নিষ্কর্মা শুধু ভাষার জোরে পূর্ব পকিস্তানকে শোষণ করার চেষ্টা করবে এবং ফলে জনসাধারণ একদিন বিদ্রোহ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।" বলা বাহুল্য, নিবন্ধটি প্রকাশের পর মুজতবা আলীকে কেবল সরকারী রোষাণলেই পড়তে হয়নি, বরঞ্চ দেশমাতৃকা ত্যাগ করে পাকিস্তানী আমল পর্যন্ত ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। ঐ ক্ষণজন্মা পণ্ডিতের ভবিষ্যদ্বানী ১৯৫২ সালে প্রথম দফা সকল বাঙ্গালীর উপলব্ধিতে আসে এবং ১৯৭১ সালে চরমভাবে প্রমাণিত হয়।

১৯৫১ সালে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে'র তুলনায় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে'র কার্য-তৎপরতা অধিকতর কার্যকর ছিল। এ সময়ে সর্বস্তরের জনগণকে আন্দোলনে শরীক করার জন্য শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে একটি স্মারকলিপি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের নিকট প্রেরণ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক বাংলা ভাষার দাবীর স্বপক্ষে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্যদের সমর্থন আদায় এবং এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় পরিষদে আন্দোলন জোরদার করার জন্য প্রত্যেক গণ-পরিষদ সদস্যের নিকট ইংরেজী ভাষায় একটি স্মারকপত্র প্রেরণ করেন। স্মারকপত্রটির বাংলা অনুবাদ পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হলো।

৪.০ রক্তে ভেজা ২১শে ফেব্রুয়ারী

পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আইন পাস না হবার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় ১৯৫২ সালের ৩১শে জানুয়ারী পুনরায় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। কাজী গোলাম মাহবুব এই পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন। পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪০ জন। এই পরিষদে আওয়ামী মুসলিম লীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, যুবলীগ, তমুদ্দুন মজলিস, ইসলামিক ব্রাদারহুড প্রভৃতি সংগঠনের এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুল, জগন্নাথ কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পরিষদের উদ্যোগে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভা অনুষ্ঠান এবং একত্রিতভবে মিছিল সহকারে প্রায় ১০/১২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে একুশে ফেব্রুয়ারী

তারিখে দেশব্যাপী হরতাল, ছাত্র ধর্মঘট ও মিছিলসহ আইন পরিষদ ঘেরাও এর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

এই সিদ্ধান্তের ফলেই সৃষ্টি হয় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর সেই মহান আন্দোলন। সরকার ঢাকা শহরে ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ১ মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করে। ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের রাতে আওয়ামী মুসলিম লীগের নওয়াবপুর রোডের অফিসে সংগ্রাম পরিষদের জরুরী সভা বসে এবং ১৬জন উপস্থিত সদস্যের ১১জনের মতামতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু অলি আহাদ, আব্দুল মতিন ও গোলাম মওলা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে তীব্র বক্তব্য পেশ করেন এবং মোহাম্মদ তোয়াহা ভোটদানে বিরত থাকেন। শেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ২১ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত ছাত্র-ছাত্রীদের মতামতানুসারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ১০ জনের একেকটি দল করে মিছিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

মোতায়েনকৃত অসংখ্য পুলিশের সশস্ত্র প্রহরা ভেঙ্গে ১০ জন বিশিষ্ট একেকটি দল মিছিল নিয়ে এগুতে থাকে আইন সভার দিকে। পুলিশ লাঠি চার্জ আরম্ভ করে। ছাত্ররা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে জবাব দেয়। পুলিশ অতঃপর কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং শেষে ছাত্রদের ওপর গুলি বর্ষণ করে। এতে শহীদ হন আবুল বরকত, রফিকুদ্দিন ও আবদুল জব্বার। ক' দিন পরে আহত আব্দুস সালামের মৃত্যু ঘটে। এর প্রতিবাদে আইন পরিষদ বর্জন করে বেরিয়ে আসেন মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, ধীরেনদত্ত, আলী আহমদ খান, শামসুদ্দিন আহমদ, খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা খাতুন এবং মনোরঞ্জন ধর। মওলানা তর্কবাগীশ ছাত্রদের জমায়েতে এসে তাঁদের মাইকে বক্তৃতা করেন। পরিষদ বর্জনকারী সাংসদগণ আহত ও নিহতদের দেখতে হাসপাতালে যান।

পরদিন এই হত্যার প্রতিবাদে ঢাকা শহর প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। সরকারী কর্মচারীরা অফিস বর্জন করে মিছিলে আসে। শ্রমিক, ব্যবসায়ী, মুটে-মজুর, ছাত্র-যুবার মিছিলে ঢাকা শহর একাকার হয়ে যায়। সেদিনও পুলিশ গুলিবর্ষণ করে এবং সফিউর রহমান ও একজন অজ্ঞাতনামা বালক নিহত হন। অনেকের মতে নিহতের সংখ্যা বেশী ছিল কিন্তু লাশগুলো পুলিশ গুম করে ফেলেছিল।

২২শে ফেব্রুয়ারী সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান ব্যাপী মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগের শাসনের অবসান ঘটার দিন ঘনিয়ে আসে সেদিন থেকেই।

৫.০ ভাষা আন্দোলনের প্রভাব

১৯২৬ সালের দিকে একবার মুসলিম লীগের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের সকল মুসলমানের ভাষা 'উর্দ্দু' করার চেষ্টা করা হয়। তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন যে, "বাংলাদেশে শতকরা নিরানব্বইয়েরও অধিকসংখ্যক মুসলমানের ভাষা বাংলা। সেই ভাষাটাকে কোনঠাসা করিয়া তাহাদের উপর যদি উর্দ্দু চাপানো হয়, তাহা হইলে তাহাদের জিহ্বার আধখান কাটিয়া দেওয়ার মত হইবে না কি ? চীন দেশে মুসলমানের সংখ্যা অল্প নহে, সেখানে কেহ বলে না যে চীনা ভাষা ত্যাগ না করিলে তাহাদের মুসলমানির খর্বতা ঘটিবে।" তিনি আরও বলেছিলেন, "বাঙালীর ঐক্যের মূল সূত্রটি কী ? আমরা এক ভাষায় কথা কই। আমরা দেশের এক প্রান্তে যে বেদনা অনুভব করি, ভাষার দ্বারা দেশের অপর সীমান্তে তাহা সঞ্চার করিয়া দিতে পারি। রাজা তাঁহার সমস্ত সৈন্যদল খাড়া করিয়া তাঁহার রাজদণ্ডের সমস্ত বিভীষিকা উদ্যত করিয়াও ইহা পারেন না।" বিশ্ব কবির বক্তব্যের সরলীকরণে বলা যায় যে, বাঙ্গালী বর্ণে নয়, ধর্মে নয়, সম্পদে নয়, কেবল ভাষার বন্ধনেই আবদ্ধ ও একতাবদ্ধ। ভাষা আন্দোলন প্রথমবারের মত বাঙ্গালী জাতিকে ঐক্যের পতাকাতলে সমবেত করেছিল।

জাতীয় জীবনে ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন মুখী প্রভাব এখানে আলোচনা করা হলো।

৫.১ রাজনৈতিক প্রভাব

ক) বিরোধী ছাত্র সংগঠনসমূহের ঐক্য

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগের ছাত্র সংগঠন 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ' কে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় ও অন্যান্য কলেজ সংসদ থেকে উৎখাত করার জন্য 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ', 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন', ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাত্র সংগঠনসমূহ 'গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে। গণতান্ত্রিক যুক্ত ফ্রন্ট ১৯৫৩ সালে ডাকসুতে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ) জয় লাভ করে এবং ডাকসুর সমাবর্তন উৎসবে নব নির্বাচিত ছাত্রী প্রতিনিধি ফরিদা বারী মালিক "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" নামক রবীন্দ্র সংগীতটি পরিবেশন করেন, যা পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে।

খ) বিরোধী রাজনৈতিক ঐক্য ও সাধারণ নির্বাচনে জয় লাভ

বিরোধী ছাত্র সংগঠন 'গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট' এর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং ছাত্র সমাজের জোর প্রচেষ্টায় হক-ভাষাণী- সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে একুশ দফার ভিত্তিতে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠিত হয়। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট শতকরা ৯৭ ভাগ ভোট পেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব কটি আসনে জয় লাভ করে। স্মরণীয় যে, ৫২ সালের ঘাতক মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনকে ময়মনসিংহের নান্দাইল কেন্দ্রে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা খালেক নওয়াজ খান। মুসলিম লীগের ভরাডুবি পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীকে এ অঞ্চল সম্পর্কে নতুন করে প্রশাসনিক সাম্যের কথা চিন্তা করতে বাধ্য করে তোলে।

গ) প্রতিবাদী ভূমিকা পালনে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি

১৯৫৮ সালে সামরিক অভ্যুথানের মাধ্যমে জেনারেল আইউব খান পাকিস্তানের সর্বময় ক্ষমতা দখলের পর পাকিস্তানের সবগুলো ভাষা লিখনের জন্য রোমান হরফ চালু এবং জাতীয় ভাষা সৃষ্টির এক ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালান। ঢাকাস্থ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে অধ্যাপক মুহম্মদ আব্দুল হাই ও মুনির চৌধুরীর উদ্যোগে আয়োজিত হয় এক প্রতিবাদ সভা। সে সময়ে আইউব খানের দৌর্দণ্ড প্রতাপের মুখেও প্রতিবাদী ভূমিকা পালনে তৎপর হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক- ছাত্রবৃন্দ এবং আইউব খানের ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে দেয়া হয়।

১৯৬২ সালে সামরিক সরকার শিক্ষা সংকোচের প্রচেষ্টায় হামিদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের চেষ্টা করলে সংগ্রামী ছাত্র সমাজ প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হয় ওয়াজিউল্লাহ, বাবুল ও মোস্তাফিজের রক্তে। তবু সফল হয় ছাত্র আন্দোলন এবং শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল হয়ে যায়।

ঘ) বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলন ও গণ অভ্যুথান

আইউব আমলে বিভিন্ন ছাত্র -আন্দোলন ও গণ অভ্যুথান সংঘটিত হয়। তার মধ্যে ১৯৬৪ সালের ছাত্র গণ আন্দোলন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ কর্তৃক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খানের 'সমাবর্তন' অনুষ্ঠান বর্জন, ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ছয় দফার স্বপক্ষে আন্দোলন ও সরকারী দমন নীতির প্রতিবাদ এবং ছাত্র সমাজের ঐতিহাসিক ১১ দফার আন্দোলন, ১৯৬৯ সালে ছাত্র ও গণ আন্দোলনের মাধ্যমে 'আগর তলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহারে চাপ সৃষ্টি এবং আইউব সরকার উৎখাত আন্দোলন অন্যতম। উনসত্তুর সালেই প্রথম উচ্চারিত হয় "তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ" শ্লোগান।

ঙ) স্বাধীনতা আন্দোলন

১৯৭০ সালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক পরিচালিত সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে একচেটিয়া ভাবে আওয়ামী লীগের ছয় দফার বিজয় ঘটে। এতে প্রমাদ গুণে পাকিস্তানী শাসকশ্রেণী এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা অর্পণে টালবাহানা আরম্ভ করে। আরেকবার ভাষা আন্দোলনের মত ইস্পাত দৃঢ় ঐক্য নিয়ে এদেশের জনগণ আন্দোলন আরম্ভ করে। অবশেষে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ নিরীহ বাঙ্গালী জাতির উপর সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিলে আরম্ভ হয় স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়।

৫.২ সাংস্কৃতিক প্রভাব

ক) বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা ও সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠান

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের আরেকটি ধারা যুক্ত হয় সাংস্কৃতিক আন্দোলনে। ঘাতক নূরুল আমীনের সরকারী বাসভবন 'বর্ধমান হাউস' কে 'বাংলা একাডেমী' তে পরিণত করা হয়, যেখানে বাংলা সাহিত্যের ও বাংলা ভাষার বিকাশের ধারা গড়ে ওঠে।

১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র শিক্ষক সমন্বয়ে একটি ঐতিহাসিক সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়; যার উদ্বোধন করেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। এই সাহিত্য সম্মেলনেই আবহমান বাঙ্গালী ঐতিহ্য ও চেতনার ভিত্তিতে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনার সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' উদ্‌যাপন করা হয়। এতে বাংলা ভাষার 'হাজার বছরের কবিতা ও গান' সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয় এবং বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি বাঙ্গালী সংস্কৃতির রূপরেখাকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়।

খ) গণ সঙ্গীতের চর্চা ও প্রসার

ভাষা আন্দোলনের অন্যতম ফসল গণ সঙ্গীত গীত হতে থাকে হাটে-বাজারে, গ্রামে-গঞ্জে। "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি", "ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়্যা নিতে চায়" এবং "বাংলা ভাষা আন্দোলন করলিরে

বাঙ্গালী, ঢাকার শহর রক্তে রাঙালী'", প্রভৃতি গণ সঙ্গীত আজও আপামর জন সাধারণের বুকের ধনে পরিণত হয়ে আছে।

গ) শহীদ মিনার ও সাংস্কৃতিক সম্মিলন ক্ষেত্র সৃষ্টি

ভাষা আন্দোলন বাঙ্গালী জাতিকে একত্রিত করার মহান ভূমিকা পালনে দিয়ে গেছে 'শহীদ মিনার'। এ যেন ঐক্যের প্রতীক। যেমন করে কবি আলাউদ্দীন আল আজাদ গেয়ে ওঠেন, "স্মৃতির মিনার ভেঙ্গেছে তোমার ? ভয় কি বন্ধু/আমরা এখনো চার কোটি পরিবার খাড়া রয়েছিতো/ যে ভিত কখনো কোন রাজন্য পারেনি ভাঙ্গতে..."। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রতীক রূপে সৃষ্ট শহীদ মিনারটি আজ জাতীয় শহীদ মিনারের মর্যাদায় ভূষিত। সে শহীদ মিনার আজ জাতীয় ঐক্য, মর্যাদা ও সাংস্কৃতিক শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের প্রধান সম্মিলন ক্ষেত্র রূপে পরিগণিত।

ঘ) ধর্ম নিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল সংস্কৃতি চর্চা

ভাষা আন্দোলন উত্তরকালে প্রগতিশীল ও ধর্ম নিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড প্রাধান্য লাভ করে। গণসঙ্গীতের পাশাপাশি গণ নাটকের প্রসার লক্ষ্য করা যায় এবং মুক্ত ও প্রগতিশীল সংস্কৃতি চর্চা আরম্ভ হয়। মুসলিম লীগের পতন ত্বরান্বিত হবার ফলে ধর্ম নিরপেক্ষ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বিকাশ লাভ করে এবং অদ্যাবধি সেই ধর্ম নিরপেক্ষ সংস্কৃতি বিদ্যমান রয়েছে।

৫.৩ অর্থনৈতিক প্রভাব

ক) আঞ্চলিক সম-উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমতার দাবী

ভাষা আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই গড়ে ওঠা যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে প্রাদেশিক তথা আঞ্চলিক সম-উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমতা বিধানের দাবী জোরদার হয়। ১৯৫৬ ও ৬২ সালে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের আর্থিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করণের প্রস্তাব একুশের চেতনার ফসল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের চাপে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী কতিপয় ক্ষেত্রে সমতা আনয়নের আশ্বাস প্রদান করে।

খ) শোষণের প্রতিবাদ ও ঐতিহাসিক ছয় দফা

আইউব আমলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে। এর প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ মজহারুল হক, অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও অন্যান্যেরা। তাঁরা বিভিন্ন ফোরামে লেখনী ও বক্তব্য দ্বারা শোষণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টা চালান এবং পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অর্থনীতি চালু করার দাবী তোলেন। এই দাবীর পটভূমিতেই গড়ে ওঠে ঐতিহাসিক ছয় দফা।

গ) সংবিধানে অন্যতম মূলনীতি হিসেবে 'সমাজতন্ত্র' গ্রহণ

ভাষা আন্দোলন বাঙ্গালী জাতিকে সমস্ত প্রকার দুঃখ, গ্লানি, অন্যায়, শোষণ ও অসাম্য থেকে মুক্ত হবার প্রেরণা এনে দেয়। তারই ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক ভাবে শোষণমুক্ত হবার জন্য বাঙ্গালী স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং ত্রিশ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সংবিধানে প্রাধান্য পায় "মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত, ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে"। উল্লেখ্য যে, সকল নাগরিকের জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা করা এবং সুষম উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব বলে স্থির করা হয়।

৬.০ উপসংহার

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে বাঙ্গালী তার মাতৃভাষা ও বাক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের সূচনা করে। ক্রমে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনা দূরীভূতকরণে আন্দোলনকে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে এগিয়ে নিয়ে যায়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ করে একুশের চেতনাকে আরেকবার সুসংহত করেছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। প্রতি বছর একুশ এসে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এদেশের শতকরা ৬৫ ভাগ এখনও নিরক্ষর, শতকরা ৬০ ভাগ দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থান করছে, গণতন্ত্র বারংবার বিপর্যস্ত হচ্ছে, তাই "শহীদের রক্তে বার বার ভিজে যাচ্ছে মাটি, আমার আনুগত্য রাখি কোথায়, কোথায় রাখি আমি?" আজকের দিনে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব দেখি কতিপয় সুনাগরিকের বিবেকের দংশনে, ব্যর্থতার ব্যথায় ক্রমাগত যাদের নুয়ে আসে মাথা।

প্রবন্ধটি বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের পাঠ্যবিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

১। আল হেলাল, বশীর (১৯৮৫) *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস* ,বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২। ইসলাম, রফিকুল (১৯৯৫) *বাংলা ভাষার ভবিষ্যত (প্রবন্ধ),* দৈনিক ইত্তেফাক, ২১শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যা–১৯৯৫, ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

৩। উমর, বদরুদ্দিন (১৯৭০) *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি,* মওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৪। দে, তপন কুমার (১৯৯৫) *আওয়ামী লীগের গোড়া পত্তন ও শামসুল হক (প্রবন্ধ),* সাপ্তাহিক বর্তমান দিনকাল, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ সংখ্যা, ফ্লোরা প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা।

৫। মতিন, আব্দুল ও রফিক, আহমদ (১৯৯১) *ভাষা আন্দোলনঃ ইতিহাস ও তাৎপর্য,* জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা।

৬। মুজতবা আলী, সৈয়দ (১৯৫০) *পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা (প্রবন্ধ),* মাসিক চতুরঙ্গ পত্রিকা, শ্রাবণ সংখ্যা–১৩৫৬, ঢাকা।

৭। রহমান ওয়াহিদ (১৯৯৫) *ভাষা আন্দোলনের ধারা ও আমাদের অস্তিত্ব (প্রবন্ধ),* দৈনিক ইনকিলাব, ১০ই মার্চ, ১৯৯৫ সংখ্যা, ইনকিলাব ভবন, ঢাকা।

৮। হক, আব্দুল (১৯৭৬) *ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৯। ——(১৩৫৪) *রবীন্দ্র রচনাবলী (খন্ড–২৩)*

১০।——(১৯৭৯) *একুশের সংকলন,* বাংলা একডেমী, ঢাকা।

১১।——(১৯৮০) *একুশের সংকলন,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

পরিশিষ্ট

(১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক গণ-পরিষদ সদস্যদের নিকট প্রেরিত স্মারকলিপি)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্টভাষা সংগ্রাম কমিটি বাংলা ভাষার দাবি গোটা দেশময় ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে পাকিস্তান গণ-পরিষদের আসন্ন অধিবেশন উপলক্ষে নিম্নোক্ত স্মারকলিপিটি সকল গণ-পরিষদ সদস্যের নিকট এবং পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকার দপ্তরে পাঠায়। ফলে গণ-পরিষদে আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং পাকিস্তান অবজার্ভার', 'পাকিস্তান টাইমস', 'খাইবার মেইল'-এর মত গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে বাংলার দাবি নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। সারা পাকিস্তানব্যাপী প্রচারের সুবিধার্থে মূল স্মারকলিপি ইংরেজিতে প্রণীত হয়েছিল। স্মারকলিপিটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে পরিশিষ্ট হিসেবে এর বাংলা অনুবাদ এখানে সংযোজিত হলো।

সমীপেষু

....

সদস্য, গণ-পরিষদ

করাচী, পাকিস্তান

জনাব,

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যারা তিন বছর পূর্বে পূর্ব বাংলায় ভাষার জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলাম তারা বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্টভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পূর্বের যেকোনো সময়েরে চেয়ে সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বেশী দৃঢ় সঙ্কল্প। আমরা সেইসব ছাত্র আপনাদের সকলের করাচীতে একত্র হওয়ার উপলক্ষকে সামনে রেখে আরো একবার আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি পূরণের জন্য আপনাকে তাগাদা দেব।

এই আন্দোলন দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও এটা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, যখন আমাদের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য জাতির উন্নয়নমূলক কজে নিয়োগ করা প্রয়োজন তখন আমরা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্টভাষা করার অস্বীকৃতি দ্বারা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টির মনে অবিশ্বাস ও ভীতি সৃষ্টির অপপ্রয়াসে লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি।

আমাদের এই আশঙ্কা ন্যায়সঙ্গত এবং যতক্ষণ এই আশঙ্কা দূরীভূত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের পূর্ববর্ণিত কর্মকাণ্ড এমন একটি জাতিকে দূরে ঠেলে দেবে যাদের সর্বান্তকরণ সহযোগিতা ছাড়া পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির স্বপ্ন কখনও বাস্তবায়িত হতে পারে না।

আঞ্চলিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতি থেকেই পাকিস্তানের উদ্ভব ঘটেছিল অথচ এই নবীন দেশটিকে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের জন্যই এখনও জীবনমরণ সংগ্রাম করতে হচ্ছে। বস্তুগতভাবে এবং চেতনাগতভাবেও পূর্ণত মুক্ত হওয়ার জন্য ইংরেজি ভাষার মাত্রাতিরিক্ত চাপ লাঘব ও প্রতিবন্ধকতা দূর করে পাকিস্তানের ভাষাগুলোর জন্য স্থান করে দেয়ার দুরূহ কাজটি করতে হলেও দীর্ঘ ও দুস্তর পথ অতিক্রম করতে হবে। কেবল মাতৃভাষাই যেহেতু মানুষের অন্তর্নিহিত অধিমানসিক ক্ষমতাসমূহকে বিকশিত করার জন্য সর্বোপযুক্ত তাই মাতৃভাষাকে কোনো স্বাধীন জাতিই অবহেলা করতে পারে না। বিদেশী ভাষার আধিপত্যই যে নিকৃষ্টতম প্রভুত্ব এবং একটি জাতিকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখার জন্য উপযোগী, বিংশ শতাব্দীর সূচনায় ফার্সি ভাষাকে বিসর্জন দিয়ে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তনকালে ইংরেজরা তা ভালভাবেই জানত।

স্বাধীনতার সূচনালগ্ন থেকেই করাচীর সরকারীমহলের কথাবার্তা থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে, তারা উর্দুকে পাকিস্তানের ভবিষ্যতের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে ধরে নিয়েছেন। আর কেন্দ্রের তরফ থেকে বাংলাভাষাকে বেমালুম ভুলে যাওয়া দেখে পাকিস্তানের এই অঞ্চলের মানুষ সেদিন আতকে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার প্রতিটি স্কুল-কলেজ এবং পত্রপত্রিকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদের গুরুগম্ভীর গর্জন উথিত হয়েছিল। শাসক গোষ্ঠীর ভাষা সংক্রান্ত এই রকম জবরদস্তি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশ রুখে দাঁড়িয়েছিল। অসংখ্য প্রতিবাদ সভা হয়েছিল, ছাত্ররা পথে নেমে পড়েছিল এবং কারাবরণ করেছিল। পূর্ব বাংলার যুবশক্তিকে ভীতসন্ত্রস্ত করার সব রকম পন্থা অবলম্বন করার পরও পূর্ব বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে নতজানু হয়ে বাংলাকে আঞ্চলিক সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার নিশ্চয়তা প্রদান এবং উর্দুর পাশাপাশি স্থান দেয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রের কাছে সুপারিশ করার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বিজয় অর্ধসমাপ্তই হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে স্পষ্ট ভাষায় ও নির্দিষ্টভাবে তাদের এ সম্পর্কিত নীতি এখনও ঘোষণা করা হয়নি। রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যদি কেন্দ্রীয় সরকার গণতন্ত্রের নীতির বরখেলাপ করে তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার সবচেয়ে বড় ভুল করবে।

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে কোনো দেশে একটা ভাষা থাকলে সমস্যার সমাধান হয় সহজ। আর একাধিক ভাষা থাকলে অগ্রাধিকারের প্রশ্ন দেখা দেয়। সেই অবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক যে ভাষায় কথা বলে, সেই ভাষা যদি যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত হয়ে থাকে এবং সেই ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য থাকে তাহলে বিনা দ্বিধায় সেই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা যায়। আর যদি অন্য ভাষাভাষী সংখ্যালঘুরা তাদের ভাষার দাবিতে সোচ্চার হয় তাহলে আমরা কানাডা বা সুইজারল্যাণ্ডের মত কয়েকটা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে দেখতে পাই।

পাকিস্তানের ক্ষেত্রে বাংলাই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণযোগ্য ভাষা। বাংলা হল সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা (পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জন মানুষ বাংলাভাষী) এবং বাংলা কেবল পাকিস্তানের নয়, সমগ্র উপমহাদেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভাষা। এই ভাষার হাজার বছরের ওপর প্রাচীন ইতিহাস আছে এবং এই ভাষার আছে বিকশিত হওয়ার ও বিদেশী ভাষার প্রভাবকে আত্মস্থ করার অদ্ভুত প্রাণশক্তি। বিগত একশ' বছরে এই ভাষার বিস্ময়কর বিকাশ ঘটেছে এবং এই ভাষা মাটির রস থেকেই তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি আহরণ করতে পারে। কেবল তাই না, এই ভাষার সংস্কৃত, হিন্দুস্তানী, উর্দু ও ফার্সি ভাষার সাথে গভীর মূলগত সংযোগ আছে। এছাড়া বাংলা এমনি একটা ভাষা যা পাশ্চাত্য সাহিত্যের মর্মবস্তুকে আত্মস্থ করেছে। উৎপত্তিসূত্রে প্রাচ্য হওয়া সত্ত্বেও এই ভাষাটি উপমহাদেশের ভাষাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন।

মন্ত্রিসভা ও সচিবালয়ের কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির উর্দুভাষী হওয়ার কারণে উর্দু কেন্দ্র সমর্থিত হওয়া সত্ত্বেও এই ভাষাটি কোনো কারণেই বাংলার তুলনায় উৎকৃষ্টতর হওয়ার যোগ্য নয়। উর্দু পাকিস্তানের কোন প্রদেশের মানুষের মাতৃভাষা নয় এবং বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, বেলুচ ও পাঠান নির্বিশেষে সকলের কাছে সমভাবে বিজাতীয়। উর্দু হল ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির প্রতীক। কোথাও এর শক্ত শিকড় নেই এবং রাজকীয় আনুকূল্য ব্যতিরেকে এই ভাষাটি টিকতে পারে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। পাকিস্তানের স্বপ্ন দ্রষ্টা ও উর্দু ভাষার এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি ইকবাল পর্যন্ত উর্দুকে তার জটিল ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে যথেষ্ট মনে করেননি। তাঁর মহান দার্শনিক কাব্য 'আশরার-ই-খুদী' রচনার ভাষা হিসেবে উর্দুকে বাদ দিয়ে ফার্সিকে অবলম্বন করতে হয়েছিল এবং তিনি খোলাখুলি স্বীকার করেছেন:

> "আমার ভাবের বিশালত্বের কারণে
> ফার্সিই কেবল হতে পারে তার উপযোগী"।
> (অহমের রহস্য', পৃ. ১৫, পঙ্‌ক্তি ১৮৩-৮৪)

এমন একটি ভাষা যা রাজনৈতিক ও ভাষাগত দিক দিয়ে রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যোগ্যতার প্রশ্নে সমূহ সন্দেহের উদ্রেক করে এবং যে ভাষাটি মুদ্রণের ক্ষেত্রে অপরিসীম

প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়, সে ভাষাটি কোনোক্রমেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না।

স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল থেকে উর্দুর স্বপক্ষে কিছু যুক্তি উপস্থিত করা হয়। এই ভাষাটিকে ইসলামীয় ভাষা হিসেবে দাবি করা হয়। আমরা বিশ্বাস করি না যে আল্লার দুনিয়ায় কোনো ভাষা ইসলামীয়, খৃষ্টীয় বা কোনো ধর্মীয় হতে পারে। আর উর্দু ইসলামীয় হলে তো বাংলাও তাই, বরং আরো বেশি, কারণ অনেক বেশি সংখ্যক মুসলমান বাংলায় কথা বলেন। দ্বিতীয়ত, উর্দুকে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশগুলোর মধ্যকার ঐক্য সংযোগকারী উপাদান সম্পন্ন ভাষা বলা হয়। এর দ্বারা যদি বোঝাতে চাওয়া হয় যে, উর্দু বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রদেশগুলোর একটা সাধারণ ভাষা হিসেবে কাজ করতে পারে তাহলে এর চেয়ে উদ্ভট কথা আর কিছু হতে পারে না। কারণ এটা পাকিস্তানের সকল অংশেই সমান বিদেশী। একটা সাধারণ ভাষা সবসময়ই একটা স্বাভাবিক ঐতিহাসিক বিকাশের পরিণতি, সাধারণ ভাষা কখনও কোনো সরকারের কৃত্রিম সৃষ্টিরূপে হয় না। সুতরাং ইসলামীয় ভাষা, যা হল উদ্ভট কিংবা সাধারণ ভাষা যা হল অলীক, কোনোটার কারণেই উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষার দাবিদার হতে পারে না।

এতদসত্ত্বেও যদি উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে তাতে অবশ্যই এইসব গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হবে ঃ ১. এর দ্বারা ইংরেজি মাধ্যমে যেমন একটা সুবিধাভোগী শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল ঠিক তেমনি উর্দু মাধ্যমে একটা সুবিধাভোগী শ্রেণী সৃষ্টি হবে। ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যারা উর্দুভাষী নন তাদের পক্ষে রাতারাতি উর্দু আয়ত্ত করা সম্ভব হবে না। এর দ্বারা গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষকে স্বল্প সংখ্যক মানুষের দ্বারা শোষণের পথকে উন্মুক্ত করা হবে, ২. এতে সাধারণভাবে পাকিস্তানীদের এবং বিশেষভাবে বাঙ্গালীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হবে এবং দেশব্যাপী সংহতির মূলে আঘাত করা হবে, যে সংহতি ছাড়া দেশটির কোনো ভবিষ্যৎও থাকবে না, এবং সর্বশেষ ৩. যে বস্তুগত ও বুদ্ধিবৃত্তিগত বিকাশ সম্ভব ক'রে একটি দেশের সংস্কৃতিগত বিকাশ ঘটে তা হবে দারুণভাবে বিঘ্নিত। একটি জাতি কেবল তার নিজস্ব ভাষার মাধ্যমেই পারে যথাযথভাবে শিক্ষিত হতে ও চিন্তা করতে। কোনো জাতির স্বাভাবিক ভাষাকে অস্বীকার করার অর্থ সেই জাতির সবকিছুকে অস্বীকার করা। আর কোনো জাতির ভাষা অপহরণ করা সেই জাতির স্বাধীন সত্তাকে কল্পকাহিনীতে পরিণত করারই নামান্তর।

সবশেষে আমরা সেই কথারই পুররাবৃত্তি করব, যে কথা আমরা বারবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে আসছি। সেটা হল; পাকিস্তানে যদি একটা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা হয় তাহলে সেটাকে হতে হবে অবশ্যই বাংলা। আর যদি একাধিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা হয়, তাহলে বাংলাকে হতে হবে তার অন্যতম। এই সহজ যুক্তি আমাদের শাসকদের মস্তিষ্কের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে কিভাবে ব্যর্থ হয় সেটা উপলব্ধি করতে আমরা অক্ষম। সব দেখেশুনে মনে হয় নিশ্চয় কোথাও মস্ত গণ্ডগোল রয়েছে। তা না হলে সোনালি আঁশের এই দেশটির ওপর এই অন্যায় ও বিমাতাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাখ্যা করাই কঠিন।

করাচীর স্বপ্নচারীরা যাদের কর্ণকুহরে বুভুক্ষু প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের আর্তনাদ ঢোকে না; তারা দিব্যি এই প্রদেশে কেমন আরবী শিক্ষার আস্তানাসমূহ প্রতিষ্ঠাকল্পে হাজার হাজার টাকা অপব্যয় করে চলেছেন। কোনদিন ইংরেজির স্থলাভিষিক্ত হবে এই সুখকর আশা নিয়ে ঐসব স্বপ্নচারী উর্দুকে সর্বতোভাবে সহায়তা করে চলেছেন এবং বাংলার ওপর আরবী হরফ চাপিয়ে দেয়ার ঘৃণ্য খেলায় মত্ত হয়ে উঠেছেন। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যারা ভাষার ব্যাপারে এই মুহূর্তে প্রাদেশিক নীতি কার্যকরীকরণের দাবি করছি এবং বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দাবি করছি, তারা অতীতে আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবির জন্য ভালই লড়েছি এবং উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেব না। আমরা পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশে পরিণত করার উদ্দেশ্যে বিরাট যে ষড়যন্ত্র চলছে তাকে উন্মোচন করে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমরা সেইসব চক্রান্তকারীর এবং জনগণের সেইসব প্রতিনিধিদের; যারা রাষ্ট্র পরিচালনার শীর্ষে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, যতদিন না বাংলা ভাষার ন্যায়সঙ্গত দাবিকে প্রদেশ এবং কেন্দ্রে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে, ততদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তথা ছাত্রসমাজ ক্ষান্ত হচ্ছি না।

তারিখ ঃ ১১ এপ্রিল, ১৯৫১

স্বাক্ষর : আবদুল মতিন
আহ্বায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি

(বি ঃ দ্র ঃ স্মারক লিপিটি আব্দুল মতিন ও আহমদ রফিক কর্তৃক প্রণীত 'ভাষা আন্দোলন ঃ ইতিহাস ও তাৎপর্য' গ্রন্থ থেকে সংকলিত)

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৪র্থ সংখ্যা, পৌষ ১৪০২, ডিসেম্বর ১৯৯৫

বাংলাদেশে দারিদ্রের স্বরূপ

গোলাম মোস্তাকীম

কবি ডি, এল, রায় লিখেছেন, 'ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা' আমাদের এ দেশ বসুন্ধরা... এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি।' এ গান এবং আরও নানা কারণে আমাদের অনেকেরই ধারণা যে এই দেশে সব সময়ই ছিল, 'গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ'। আসলে কিন্তু বাংলাদেশের আর্থ–সামাজিক অবস্থা কখনই এতটা সহজ ও মসৃণ ছিল না। প্রাচুর্য ছিল তবে তা মাত্র গুটিকয়েক লোক ভোগ করত। দেশের অধিকাংশ লোকই থাকত দরিদ্র এবং নানা সমস্যায় জর্জরিত। মোট কথা, বাংলাদেশে আগেও দারিদ্র ছিল সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে এখনও দেশে দারিদ্র বিরাজিত। এই দারিদ্রের সংজ্ঞা, বর্তমান অবস্থা এবং এ থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তা ক্রমশঃ আলোচনা করা হবে।

২.০ দারিদ্রের আভিধানিক অর্থ

২.১ হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গীয় শব্দকোষে দারিদ্রের অর্থের আলোচনা করতে গিয়ে নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেনঃ

দারিদ্র –দরিদ্রভাব , নির্ধনতা, দৈন্য।

দৈন্য–১। দীনভাব, দারিদ্র ২. কার্পণ্য,৩. শোচনীয় ভাব, মালিন্য, ৪. বিপদ,অবসাদ, ৫. অনুদারকভাব, সঙ্কীর্ণতা, ৬. নিজহেয়তা ৭. কাতরতা .৮. অভাব।

২.২ আমরা এ সকল শব্দগুলো থেকে মোটামুটি সাধারণভাবে বুঝতে পারি দারিদ্র বলতে কি বুঝায়। এবার দেখা যাক, অর্থনীতিবিদগণ দারিদ্র বলতে কি বুঝেন।

৩.০ দারিদ্রের সংজ্ঞা

৩.১ মজার কথা হল যে দারিদ্র সম্পর্কে প্রথমে আলোকপাত করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদ গলব্রেথ। তিনি ১৯৫৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ঐশ্বর্যমন্ডিত দেশে দারিদ্রের সরব উপস্থিতি খেয়াল করলেন। তখন থেকেই দারিদ্র নিয়ে আলাপ – আলোচনা হচ্ছে।

৩.২ দারিদ্রকে অর্থনীতিতে দু' ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 'দারিদ্র' হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যেখানে মানুষ তাঁর ন্যূনতম শরীরবৃত্তীয় প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হয়। এ অবস্থাকে অনাপেক্ষিক দারিদ্র (Absolute Poverty) বলে। এ অবস্থায় যখন বাংলাদেশে কেউ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষিসংস্থা (FAO)-র মতে দৈনিক মাথাপিছু ২১৫০ কিলোক্যালরী এবং বিশ্বব্যাংকের মতে ২,১২২ কিলোক্যালরী মানের খাদ্য গ্রহণে ব্যর্থ হন তখন তিনি অনাপেক্ষিক দারিদ্রে ভুগছেন বলে বলা যায়।

৩.৩ তবে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) সাধারণভাবে ২,৩৩২ কিলোক্যালরী মানের খাদ্য গ্রহণের সুপারিশ করে থাকে।

৩.৪ দারিদ্রের অন্য অবস্থাকে বলা হয় আপেক্ষিক দারিদ্র (Relative Poverty) । এ অবস্থা কোন নির্দিষ্ট সমাজের আয় অথবা সম্পদ বিতরণে একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবারের অবস্থা সূচক নির্দেশক। এ সূচক নানা দেশের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে নানা রকম হতে পারে।

৩.৫ দারিদ্রের আরও অনেক সংজ্ঞা অনেকে দিয়েছেন। তবে ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন অনাপেক্ষিক ও আপেক্ষিক দারিদ্রের সমন্বয়ে দারিদ্রের একটি নতুন পরিমাপ ব্যবহার করেছেন। এ পরিমাপকে "সেন সূচক" (Sen's Index) বলা হয়ে থাকে।

৪.০ দারিদ্র রেখা

৪.১ দারিদ্র রেখা বলতে আমরা রোজগারের এমন একটি পর্যায় বুঝি যা দিয়ে মানুষ তার ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে পারে না। (The income level below which a minium nutritional adequate diet plus essential non food requirements are not affordable) এটা এমন একটি পর্যায় যেখানে মানুষ তাঁর ন্যূনতম শরীরবৃত্তীয় প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হয়।

৪.২ দারিদ্র রেখারও অনেক ব্যাখ্যা অনেকেই অনেক রকমভাবে করেছেন । এ নিয়ে কবি তারাপদ রায় তাঁর বিখ্যাত "দারিদ্র রেখা" নামক কবিতাটি লিখেছেন

দারিদ্র রেখা

–তারাপদ রায়

আমি নিতান্ত গরীব ছিলাম, খুবই গরীব।
আমার ক্ষুধার অন্ন ছিলো না,
আমার লজ্জা নিবারণের কাপড় ছিলো না,
আমার মাথার উপরে আচ্ছাদন ছিলো না।
অসীম দয়ার শরীর আপনার।
আপনি এসে আমাকে বললেন, না গরীব
কথাটা খুব খারাপ।
ওতে মানুষের মর্যাদা হানি হয়।
তুমি আসলে দরিদ্র।

অপরিসীম দারিদ্রের মধ্যে আমার কষ্টের দিন।
আমার কষ্টের দিন, দিনের পর দিন আর শেষ
হয় না।
আমি আরো জীর্ণ আরো ক্লিষ্ট হয়ে গেলাম।
হঠাৎ আপনি আবার এলেন, এসে বললেন,
দ্যাখো, বিবেচনা করে দেখলাম।
দরিদ্র শব্দটিও ভালো নয় তুমি হলে নিঃস্ব।
দীর্ঘ নিঃস্বতায় আমার দিন রাত্রি।
গনগনে গরমে ধুঁকতে ধুঁকতে।
শীতের রাতের ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে। বর্ষার
জলে ভিজতে ভিজতে।
আমি নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে গেলাম।
আপনার কিন্তু ক্লান্তি নেই।
আপনি আবার এলেন, আপনি, বললেন,
তোমার নিঃস্বতার কোনো মানে হয় না, তুমি
নিঃস্ব হবে কেন।
তোমাকে চিরকাল শুধু বঞ্চনা করা
হয়েছে।
তুমি বঞ্চিত,তুমি চির বঞ্চিত।

আমার–বঞ্চনার অবসান নেই,
বছরের পর বছর আধপেটা খেয়ে।
উদোম আকাশের নিচে রাস্তায় শুয়ে।
কঙ্কালসার আমার বেঁচে থাকা।
কিন্তু আপনি আমাকে ভোলেননি।
কিন্তু আপনার মুষ্টি বদ্ধ হাত।
আপনি এসে উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দিলেন।
'জাগো ; জাগো' সর্বহারা'।
তখন আর আমার জাগবার ক্ষমতা নেই।
ক্ষুধায় অনাহারে আমি শেষ হয়ে এসেছি।
আমার বুকের পাজর হাপরের মত ওঠা নামা
করছে।
আপনার উৎসাহ ও উদ্দীপনার সংগে।
আমি তাল মেলাতে পারছি না।
ইতিমধ্যে আরো বহুদিন গিয়েছে।
আপনি এখন আরো বুদ্ধিমান।
আরো চৌকশ হয়েছেন।
এবার আপনি একটি ব্ল্যাক–বোর্ড নিয়ে
বসেছেন।
সেখানে চকখড়ি দিয়ে যত্ন করে
একটা ঝকঝকে লম্বা লাইন টেনে দিয়েছেন।
এবার বড় পরিশ্রম হয়েছে আপনার কপালের
ঘাম মুছে আমাকে বলেছেন। এই যে রেখা
দেখছো, এর নিচে।
অনেক নিচে তুমি রয়েছে।

চমৎকার।
আপনাকে ধন্যবাদ, বহু ধন্যবাদ।
আমার গরীবপনার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।
আমার দারিদ্রের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ
আমার নিঃস্বতার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।
আমার ব্যর্থতার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।
আমার সর্বহারাত্বের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।
আর সর্বশেষে ঐ ঝকঝকে লম্ব রেখাটি।
ঐ উজ্জল উপহারটির জন্যে আপনাকে বহু
ধন্যবাদ

কিন্তু,
ক্রমশ,
আমার ক্ষুধার অন্ন এখন আরো কমে গেছে।
আমার লজ্জা নিবারণের কাপড় এখন আরো
ছিঁড়ে গেছে আমার মাথার উপরের আচ্ছাদন
আরো সরে গেছে।
কিন্তু ধন্যবাদ,
হে প্রগাঢ় হিতৈষী, আপনাকে বহু ধন্যবাদ।

৫.০ বাংলাদেশে দারিদ্র সংক্রান্ত গবেষণা

৫.১ বর্তমানে বিভিন্ন সংগঠন যথা World Bank, FAO (Food and Agriculture Organisation), UNDP (United Nations Development Programme), IFAD (International Fund for Agricultural Development), WFP (World Food Programme), BIDS বাংলাদেশের দারিদ্র সম্পর্কে গবেষণা করছে। এসকল গবেষণা মূলতঃ তিনটি উৎসের উপর নির্ভর করে শুরু হয়েছে। উৎসগুলো হচ্ছেঃ

(অ) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন খাদ্য ব্যয় জরিপ (Household Expenditure Survey) (HES); 1976-77,1981-82, 1983-84, 1985-86).

(আ) পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান সংক্রান্ত জরিপ। ১৯৮১-৮২ সালে এ সংক্রান্ত সর্বশেষে জরিপ হয়েছে।

(ই) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর দারিদ্র সম্পর্কিত বিভিন্ন চলকের উপর জরিপ ও শুমারী। এতে অন্যান্য সূচকের মধ্যে জনসংখ্যা ও শ্রম বিষয়ক জরিপসমূহ রয়েছে।

৫.২ এছাড়া বিআইডিএস ১৯৮৯-৯০ সালে এনালিসিস অব পভার্টি ট্রেন্ডস প্রকল্প নামে দারিদ্রের উপর জরিপ করেছে।

৬.০ বাংলাদেশে দারিদ্রের ঐতিহাসিক ধারা

৬.১ পূর্বেই বলা হয়েছে যে এ দেশে প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগে (খ্রীষ্টাব্দ ১২০৩-১৭৫৭) সম্পদ ছিল, প্রাচুর্য ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্রও ছিল। কৃষি শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে এদেশ উন্নত ছিল। কিন্তু সম্পদের সুষম বন্টন না থাকাতে সমাজে অনেক দারিদ্রক্লিষ্ট লোক ছিল। ঐতিহাসিক ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাসে' (আদি পর্ব) জানিয়েছেন, তৎকালে বাংলাদেশে সুখ-সমৃদ্ধি ছিল এবং সমাজের নিম্নস্তরে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের মধ্যে দারিদ্রও ছিল। ঐতিহাসিক ডঃ আব্দুর রহিম লিখেছেন যে মধ্যযুগে দারিদ্রের অবস্থা এমন ভয়াবহ ছিল যে দারিদ্রের কারণে ছেলেদের খোজা করে বিক্রি করে দেয়া হত। টাকা -পয়সা, ধন-দৌলত, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই ছিল কিন্তু সম্পদের সম বন্টন ছিল না।

৬.২ বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকে বেশ কয়েকটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের খবর জানা যায়। গত ২য়/ ৩য় শতকে পুন্ডনগর অর্থাৎ বর্তমান বগুড়ায় প্রাকৃতিক কারণে প্রথম দুর্ভিক্ষের কথা জানা যায়।

৬.৩ ৯ম শতকে গৌড়ের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তা ছিল মনুষ্য সৃষ্ট।

৬.৪ ১৫৩৮ সালে নবদ্বীপ ও তৎসংলগ্ন তালতলায় তৃতীয় দুর্ভিক্ষটি হয়েছিল। ১৬৬১–৬৩ সালে হয়েছিল চতুর্থ দুর্ভিক্ষ। তারপর যে দুর্ভিক্ষের কথা শুনে এখনও এ দেশের লোক শিউরে উঠে তা হ'ল ১৭৬৯ সাল তথা ১১৭৬ সালের মন্বন্তর। সারা বাংলাদেশে এ দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতা এত ছিল যে তা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। পলাশী যুদ্ধের ঠিক ১২ বছর পর বাংলাদেশে এই দুর্যোগ নেমে আসে।

৬.৫ তারপর ষষ্ঠ দুর্ভিক্ষটি ঘটে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, ১৯৪৩ সালে। ব্যাপকতার কারণে এ দুর্ভিক্ষটিও পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে পরিচিত। বয়স্ক মানুষের মনে এ দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ স্মৃতি এখনও জেগে আছে। UNDP-র ১৯৯৪ সালের Human Development Report-এ লেখা হয়েছেঃ

Starvation amid Plenty- the Bengal famine of 1943

Famines are commonly thought of as Nature's revenge of hapless humanity. Although Nature can certainly create local food shortages, human beings turn these food shortages into widespread famine. People go hungry not because food is unavailable but because they cannot afford it.

The Bengal famine of 1943 shows why. Between two million and three willion lives were lost, even though there was no overall shortage of food. In fact, the per capita supply of foodgrains in 1943 was 9% higher than in 1941.

The famine was partly a product of economic boom. Sudden increases in war-related activities exerted powerful inflationary pressures on the economy and caused food prices to rise. In the urban areas, those with work could pay these prices. But in the rural areas, agricultural labourers and other workers found they could no longer afford to eat,

and thousands headed for the cities, particularly Calcutta in the hope of survival. Prices were then driven even higher by speculation and panic buying.

The famine could probably have been averted by timely government action. But the colonial government did nothing to stop hoarding by producer, traders and consumers. The general policy was "wait and see" . Relief work was totally inadequate, and the distribution of food grains to the rural districts was inefficient. Even in October 1943, with 100,000 sick and destitute people on the streets of Calcutta, the government continued to deny the existence of a famine.

The result was one of the largest man-made catastrophes of our time.(HUMAN DEVELOPMENT REPORT 1994, P.27)

৬.৬ বলাই বাহুল্য যে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্রতম দেশ। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির কারণে গত দুই দশকে দারিদ্রমান মাথাপিছু জাতীয় আয়ের তুলনায় হ্রাস পায়নি।

৬.৭ ১৯৬০ সন থেকে যেখানে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে বার্ষিক ২.৮৫% হারে সেখানে ২.৫৫% হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মাথাপিছু জাতীয় আয় বেড়েছে মাত্র ০.৩% হারে। এতে দরিদ্র জনসাধারণের দারিদ্রের মাত্রা বেড়ে গিয়েছে, জাতীয় আয়বৃদ্ধির সুফল তারা পায়নি। উপরন্তু শতকরা ৬৩ ভাগ সম্পদ ভোগ করত দেশের ৭৫ শতাংশ জনসাধারণ ১৯৬৩-৬৪ সালে, ১৯৭৬-৭৭ সনে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫২.৩ শতাংশে।

৭.০ দারিদ্রের বর্তমান অবস্থা

৭.১ গত বিশ বছরে দেখা গিয়েছে যে সত্তর দশকের তুলনায় আশির দশকে শহরাঞ্চলে দারিদ্র দ্রুত গতিতে কমতে থাকে এবং গ্রামীণ দারিদ্র বাড়তে থাকে। আশির দশকে গ্রামীণ দারিদ্র কমতে থাকে।

সারণী–১

দারিদ্রসীমা ও দারিদ্রপীড়িত জনসমস্যার হার ১৯৭৩–৭৪, ১৯৮৫–৮৬

জরিপের বছর	দারিদ্র সীমাসূচক আয় (টাকা,মাথাপিছু)		দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার শতকরা হার	
	পল্লীঅঞ্চল	শহরাঞ্চল	পল্লীঅঞ্চল	শহরাঞ্চল
১৯৭৩–৭৪	৮৭.০৬	৯৬.৭৩	৬৫.২৫	৬২.২৫
১৯৮১–৮২	২৪১.২৫	২৬৮.০৫	৭৯.১২	৫০.৬৬
১৯৮৩–৮৪	৩১১.৭৮	৩১১.৭৮	৪৯.৮১	৩৯.৫২
১৯৯৫–৮৬	৩১১.৯২	৩৬৮.৮০	৪৭.০৮	২৯.১১

উৎস ঃ Atiq Rahman and Trina Hoque, Poverty and Inequality in Bangladesh in the Eighties: An Analysis of some Recent Evidence.

৭.২ উপরের সারণী থেকে দেখা যায় যে শহরাঞ্চলে তুলনামূলকভাবে মাথাপিছু আয়ও বেড়েছে এবং দারিদ্রও হ্রাস পেয়েছে। তবে ১৯৮১–৮২ সাল থেকে ১৯৮৩–৮৪ সালে পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র শতকরা৩০% ভাগ কমেছে। এ পরিসংখ্যান নিয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং এর যৌক্তিকতা অনেকেই মেনে নিতে পারেননি।

সারণী—২

৭.৩ সম্পদ, দারিদ্র ও সামাজিক বিনিয়োগ

দেশের নাম	জিএনপি মার্কিন ডলার	আয়ের বন্টন সর্বনিম্ন ৪০% ভাগ পরিবার	সর্বোচ্চ ২০% তাদের সঙ্গে সর্বনিম্ন ২০% ভাগের অনুপাত	চরম দারিদ্রে বসবাসরত জনসাধারণ সর্বমোট	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
		১৯৮০-৯১	১৯৮০-৯১	১৯৮০-৯০	১৯৮০-৯০	১৯৮০-৯১
পাকিস্তান	৪০০	২১.৩	৪.৭	২৮	২৯	২৬
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
ভারত	৩৩০	২১.৩	৪.৭	৪০	৪২	৩৩
বাংলাদেশ	২২০	২২.৯	৪.১	৭৮	৮৬	-
ভূটান	১৯০	–		–	৯০	-
নেপাল	১৮০	২২.০	৪.৩	৬০	৬১	৫১
শ্রীলংকা	৫০০	১৩.৩	১১.৫	৩৯	৪৬	১৫
মালদ্বীপ	৪৭০	–	–	৪০	–	–
দক্ষিণ কোরিয়া	৬৩৫০	–	–	৫	৪	৫
থাইল্যান্ড	১৬৫০	১৫.৫	৮.৩	৩০	৩৪	১৭

(Human Development Report, 1994, UNDP, P. 195)

৭.৪ উপরের সারণী থেকে দেখা যায় যে একমাত্র ভুটানের গ্রামাঞ্চলের লোকজন বাংলাদেশের থেকে বেশি গরীব। এমনকি পাশের ১০০ কোটি জনসাধারণের দেশ ভারতে চরম দরিদ্র লোকের সংখ্যা আমাদের দেশের থেকে অর্ধেক। যে দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা ৬০ এর দশকের শুরুতে আমাদের দেশ থেকেও খারাপ ছিল সেখানের জনসংখ্যার মাত্র ৫% ভাগ লোক চরম দরিদ্র, সেখানে আমাদের দেশের সংখ্যা ৭৮% । এতেই বোঝা যায় বাংলাদেশের জনসাধারণের শতকরা ৭৮ জন চরম দরিদ্র।

৮.০ দারিদ্রের কারণ

৮.১ দারিদ্রের নানা কারণ থাকতে পারে। প্রাথমিকভাবে দুটো কারণ নির্ণয় করা যেতে পারে। প্রথমতঃ দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করলে মানুষ জন্মগত ভাবে দারিদ্রে ভোগে। এছাড়া দ্বিতীয় কারণটি হল যে মানুষের ভিতর যে সুপ্ত সম্ভবনা ও ক্ষমতা রয়েছে তা মানুষ সঠিকভাবে ব্যবহার করার সুযোগ পায় না। ফলে সে দারিদ্রে নিপতিত হয় এবং এ অবস্থা থেকে আর উঠতে পারে না।

৮.২ যে সকল কারণে মানুষ দারিদ্র ভোগ করতে বাধ্য হয় তা নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।

৮.৩ শিক্ষা

যদিও শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার তবুও নানা কারণে মানুষ এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার শতকরা ৩৭ জন। গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে সাধারণত: অশিক্ষা–কুশিক্ষা, অজ্ঞতাই চোখে পড়ে এবং তা হয়ে উঠে পীড়াদায়ক। উপরে যে শিক্ষার হার তুলে ধরা হয়েছে তা ঠিক করা হয়েছে। অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন, এই ভিত্তিতে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেশের শিক্ষিতের হার ১০ ভাগের কম। এই শিক্ষা আবার সব সময় বিজ্ঞান ভিত্তিক নয়। সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাবে মানুষ নানা রকম রোগে ভুগে থাকে এবং তাঁর কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়।

৮.৪ ধর্ম, কুসংস্কার ও অজ্ঞতা

এই শতাব্দীর শুরু থেকেই ধর্মকে রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইসলাম ধর্মের পবিত্র কোরআন শরীফ শুরুই হয়েছে 'ইকরা' অর্থাৎ পড় এই শব্দ দিয়ে । কিন্তু এর সত্যিকার বাস্তবায়ন করতে আমরা বারবার ব্যর্থ হচ্ছি। পবিত্র হাদীস শরীফে আছে, 'একজন শহীদের রক্তের চেয়ে একজন জ্ঞানীর কলমের কালি অধিক পবিত্র ।' এর পরও বর্তমানে সারা বিশ্বে তথা বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশ লোক ধর্মীয় অজ্ঞতায় ভুগছে । ধর্মের মধ্যে অনেক ভাল বক্তব্য ও দিক নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু নানা কারণে তা আমাদের সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রচার করা হয় না। নিঃসন্দেহে ধর্মে অনেক ভাল দিক আছে। তার প্রতি ধর্ম ব্যবসায়ীদের কোন আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় না। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে কুসংস্কার ও গোঁড়ামী অন্ধত্বকে ধর্মের

সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ফলে ধর্ম হয়ে পড়েছে চলৎশক্তিহীন। এ অবস্থার আশু পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন।

৮.৫ প্রকৃতি নির্ভরতা

আমাদের দেশে সীমিত পরিমাণে চাষাবাদে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করার পরেও কৃষকরা অনেকাংশে প্রকৃতির উপর নির্ভর করে থাকে। ফলে তারা মাটির দিকে না তাকিয়ে অধিকাংশ সময়েই আকাশের দিকে পরিমিত রোদ ও বৃষ্টির জন্য তাকিয়ে থাকে। প্রকৃতি নির্ভরতা মানে ফসল হানি, এর অর্থ অনাহার,দারিদ্র ও অনুন্নয়ন।

৮.৬ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার না করা

আমাদের দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে । এবং যে সম্পদ আছে তাও আমরা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হই। আমাদের দেশে পানি, খনিজ, বালি, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, পাহাড়ী অঞ্চল , সুন্দরবন অঞ্চল ইত্যাদি বহু সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। গ্রামে অনেক পতিত জমি এবং মজা পুকুর আছে যেখানে ফসল ও মাছের চাষ করে আমরা জনগণের আয় বাড়াতে পারি। আমাদের দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিরাট এলাকা জুড়ে সমুদ্রোপকূল রয়েছে, যেখানে আমরা লবণ উৎপাদন করতে পারি এবং গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার কলাকৌশল চালু করতে পারি। আমাদের সমুদ্র এলাকা থেকে ভারত ও থাইল্যান্ডের জেলেরা মাছ ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু আমরা তেমন কিছুই করতে পারছি না।

৮.৭ প্রযুক্তিহীনতা

নানা কারণে আমরা বর্তমান উন্নত বিশ্বের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারছি না। অর্থের যোগান ও মানসিক পরিবর্তন এ দুটো বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে। তবে এজন্য সময়ের প্রয়োজন। আমাদের সব সময় লাগসই প্রযুক্তি (Appropriate Technology) ব্যবহার করার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৮.৮ ভূমি সংস্কার

৮.৮.১ ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর ১৯৫২ সালে জমিদারী প্রথার বিলাপ করা হয়। তারপর দু' বার ভূমি সংস্কারের জন্য সরকারীভাবে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে আমাদের অনেক দূর যেতে হবে।

৮.৮.২ বাংলাদেশে বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজে ভূমির অধিকার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। যারা জমির মালিক তারা সাধারণত: গ্রামে থাকেন না। তাছাড়া ভূমির মালিকগণ সাধারণত: নিজেদের স্বার্থটাই স্বাভাবিকভাবেই আগে দেখে থাকেন, দেশের বা যারা জমি চাষ করেন তাদের স্বার্থ দেখা হয় না। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অনেক জমির মালিকই এক ফসলের বেশি চাষ করতে রাজি হন না। কারণ হিসেবে অনেকে বলে থাকেন যে প্রান্তিক চাষী বা ভূমিহীন চাষীদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হলে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে তাদের অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। তাছড়া উন্নত বীজ ,সার, কীটনাশক ও পানি সেচের জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যয় ভার কেউ বহন না করার কারণেও অনেক সময় অনেক জমি পতিত থাকে। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী আরও দরিদ্র হতে থাকে।

সারণী – ৩

পল্লী বাংলার ভূমি মালিকানার প্রকৃতি

ভূমি মালিকানা ভিত্তিক দল (একরে)	খানার সংখ্যা (হাজার)	শতাংশ -	খানার সংখ্যা (হাজার)	শতাংশ -	বার্ষিক পরিবর্তনের হার (শতাংশে)
কার্যত ভূমিহীন	৬২২৫	৪৮.৫	৬৩৯৯	৪৬.৩	০.৪
ভূমিহীন	১৯৭৯	১৫.৪	১১৯৮	৮.৭	৮.৭
০.৫ একরের কম	৪২৮৬	৩৩.৩	৫২৯৪	৩৭.৬	৩.৬
ভূমি খানা	৬৬৩১	৫১.৫	৭৪১৯	৫৩.৬	২.১
০৫. ০–০.৯৯	১৫১৬	১১.৮	১৬৬০	১২.০	১.৭
১.০০–২.৪৯	২৬৬০	২০.৬	২৯৭৯	২১.৬	২.১
২.৫০–৪.৯৯	১৪৩৬	১১.১	১৫৮৯	১১.৬	২.০
৫.০০–৭.৪৯	৫০১	৩.৯	৬৫০	৪.৭	৪.৯
৭.৫০–১৪.৯৯	৩৭৪	২.৯	৪১৫	৩.০	১.৯
১৫.০০+	১১৪	০.৯	১১৭	০.৯	০.৫
মোট	২৮৮৬	১০০.০	১৩৮১৮	১০০.০	১.৩

সূত্রঃ বিবিএস, ১৯৮৩–৮৪ কৃষি শুমার ও পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ।

৮.৮.৪ উপরের সারণী থেকে দেখা যায় যে দেশের প্রায় অর্ধেক কৃষিখানা কার্যত ভূমিহীন। এ সকল খানার সদস্য প্রায় ছয় কোটি । কৃষিখাতে প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বাড়তে পারে । তবে তা সরাসরি কৃষকের কোন উপকারে আসে না। অসম ভূমি বন্টনের ফলে গ্রামীণ দারিদ্র ক্রমাগত বাড়ছে।

৮.৯ শিল্পায়ন

নানা কারণে এদেশে এখনও শিল্প গড়ে উঠেনি। আর্থিক সংকুলান, দক্ষ শ্রমিকের অভাব, অকার্যকর সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুৎপাদক খাতে ব্যয়ের মানসিকতার কারণে এ দেশে এখনও তেমন কোন ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। স্বাধীনোত্তর কালে প্রায় সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হয়। তবে সেগুলো ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষ ব্যবস্থাপক গোষ্ঠী না থাকাতে জাতীয়করণের নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলে ৭০ দশকের শেষের দিকে জাতীয়করণকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তিগত মালিকানায় ছেড়ে দেয়ার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে । বর্তমানে সে প্রক্রিয়া এখনও চালু আছে।

৮.১০ বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরতা

স্বাধীনোত্তর কালে গত দু'দশকে বাংলাদেশে প্রায় ৫৬ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গেছে। কিন্তু এত বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার পরও দুঃখজনক হলেও সত্যি যে বাংলাদেশে প্রকৃত কোন উন্নয়ন ঘটেনি এবং দারিদ্রের অবসান হয়নি। সমাজের বিত্তশালী লোকজনই শুধু উপকৃত হয়েছে। সাধারণ মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি।

৮.১১ জনসংখ্যা বৃদ্ধি

জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করা হলেও অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি । গত তিন দশক ধরে দেশে পরিবার পরিকল্পনার কাজ চলছে। কিন্ত এক্ষেত্রে সাফল্য খুবই সীমিত। শহরাঞ্চলে এই কার্যক্রম সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। এ অবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে ।

৮.১২ রাজনৈতিক অস্থিরতা

একটা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ের জন্য রাজনৈতিক স্থিরতার একান্ত প্রয়োজন। এটা একটা বাস্তব সত্য যে, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর এ দেশে নানা কারণে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছে। আরও একটা বড় অসুবিধা হল যে, বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের কোন ধারাবাহিকতা নেই। এক সরকারের আমলে গৃহীত কার্যক্রম পরের সরকার এসে বাতিল করে দেন। তাতে আমাদের সেই বানরের তৈলাক্ত বাঁশে আরোহণের অংকটির কথাই মনে করিয়ে দেয়। এ অবস্থার কারণে দেশে আশানুরূপ বৈদেশিক বিনিয়োগও হচ্ছে না। আসলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ব্যাপক গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রয়োজন।

৮.১৩ শ্রমিক অসন্তোষঃ হরতাল ধর্মঘট

নানা কারণে বাংলাদেশে প্রায়ই শ্রমিক অসন্তোষ দেখা যায়। তাছাড়া গত দশকে রাজনৈতিক কারণে দেশে প্রায়ই হরতাল পালিত হয়ে আসছে। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার উপর এর মারাত্বক ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রায় ক্ষেত্রেই উৎপাদন দারুণভাবে ব্যহত হয়। শ্রমিক শ্রেণীর লোকজন এবং যে সকল লোক দিন আনে দিন খায় তারাই এ সকল হরতালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

৮.১৪ সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজী

দুঃখজনক হলেও সত্যি যে সারা বাংলাদেশে সন্ত্রাস এবং চাঁদাবাজী একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে চলেছে। যারাই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকান্ডের সঙ্গে জড়িত তাঁরাই এ সন্ত্রাস এবং চাদাবাজীর শিকার হন সবচেয়ে বেশি। বিষয় দুটোর শিকড় এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে ছাত্র সমাজও এর দ্বারা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রদের সন্ত্রাসের কারণে কোন উন্নয়নমূলক কাজ করা যাচ্ছে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাঁদাবাজীর কারণে গত কয়েক বছরে কয়েকজন ছাত্র তাদের বন্ধুদের দ্বারাই নিহত হয়েছে। গ্রামের একজন সাধারণ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীও এ সকল সন্ত্রাসীদের হাত থেকেও রেহাই পান না। বাংলাদেশে আজ প্রায় প্রতিটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজীদের মাসোহারা দিয়ে চলতে হয়।

৮.১৫ পিতৃতান্ত্রিক ধ্যান–ধারণা

আমাদের দেশে অনেকেই তাদের পৈতৃক পেশা গ্রহণ করে থাকেন। জেলের ছেলে জেলে, কামারের ছেলে কামার, কুমোরের ছেলে কুমোর হবে এটাই সামাজিক নিয়ম

এবং প্রত্যাশা, কিন্তু নানা কারণে আজকাল এ সব পেশায় জীবন ধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রাচীন ধ্যান-ধারণার কারণেই তারা তাদের নিজস্ব পারিবারিক পেশাগত বলয় থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না। এতে দারিদ্র বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার দারিদ্র বাড়ছে।

৮.১৬ অপচয় করার প্রবণতা

পবিত্র কোরআন শরীফে বলা হয়েছে "যারা অপচয় করে তারা শয়তানের ভাই"। এ রকম সুস্পষ্ট ধর্মীয় নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশের অনেক লোকজন নানা কারণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অধিক খরচ করে ঋণের ভারে জর্জরিত হয়ে পড়েন। এবং ঋণের বোঝা থেকে তাঁরা বেরিয়ে আসতে পারেন না। গ্রামে এ সকল বিষয় বেশি করে ঘটে থাকে। অনেক সময় চাষের জমি বন্ধক রেখে কিংবা মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নিয়ে লোকজন অনেক অনুষ্ঠান করে থাকেন। দেখা যায় যে এ ঋণ পরিশোধের জন্য ভিটেমাটি বিক্রি করে সে রাস্তায় নেমে পড়তে বাধ্য হয়।

৮.১৭ নারীদের সামাজিক অবস্থান

বাংলাদেশে পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা আজও তাঁদের যোগ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। নানা কারণে তারা বঞ্চনা, শোষণ ও পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়ে থাকে। ঘরের কাজ করতে হবে বলে মেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠানো হয় না। সংসারে আর্থিক অনটন দেখা দিলে মেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়া হয়। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে মেয়েরা বাইরে কাজ করতে পারে না। তাছাড়া যৌতুকের কারণে মেয়েদের যথা সময়ে বিয়ে পর্যন্ত দেয়া যাচ্ছে না। এ সকল কারণে অর্থনৈতিকভাবে আমাদের সমাজে মেয়েরা পঙ্গু হয়ে আছে। এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

৯.০ দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি

৯.১ বাংলাদেশের এ প্রকট দারিদ্র থেকে মুক্তির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

সারণী–৪

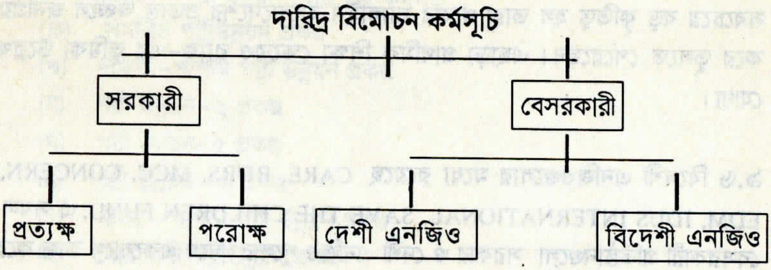

৯.২ উপরের সারণী থেকে দেখা যায় যে দারিদ্র বিমোচনে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা চলছে। প্রত্যক্ষ কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আদর্শ গ্রাম প্রকল্প। পরোক্ষ কর্মসূচি হিসেবে পল্লী উন্নয়ন–১ প্রকল্পের কথা বলা যায়। দারিদ্র বিমোচনে সরকারী কর্মসূচি 'পরিশিষ্ট–ক' তে দেখানো হল।

৯.৩ এ ছাড়াও সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ কর্তৃক গৃহীত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম, পৌরসভার বাইরের স্কুলের মেয়েদের মধ্যে উপ–বৃত্তির প্রচলন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসুচি' গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

৯.৪ এনজিও কার্যক্রম

সরকারী কর্মসূচির পাশাপাশি অনেক দেশী ও বিদেশী এনজিও বিশেষ করে গ্রামীণ দারিদ্র নিরসনের জন্য একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। দেশীয় এনজিওগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ প্রশিকা ঢাকা, প্রশিকা কুমিল্লা, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সিসিডিবি, কারিতাস, নিজেরা করি, বাঁচতে শেখা, ওয়ার্ল্ড ভিশন, আশা, গণউন্নয়ন প্রচেষ্টা, বাংলা জার্মান সম্প্রীতি, গ্রামীণ ব্যাংক ইত্যাদি। গ্রামীণ ব্যাংক থেকে দরিদ্র ও নিঃস্ব মহিলাদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করে তাদেরকে কর্মক্ষম করে তোলা হচ্ছে এবং তাদের ঋণ পরিশোধের হার প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ। গ্রামীণ ব্যাংক সাধারণত: মহিলাদের নিয়েই কাজ করে থাকেন।

৯.৫ ব্র্যাকও দারিদ্র দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। ব্র্যাকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল তারা খাবার স্যালাইন বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনপ্রিয় করে তুলতে পেরেছেন। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রেও ব্র্যাক-এর ভূমিকা উল্লেখ যোগ্য।

৯.৬ বিদেশী এনজিওগুলোর মধ্যে রয়েছে CARE, BDRS, MCC, CONCERN, EDM, IDUS INTERNATIONAL, SAVE THE CHILDREN FUND. এ সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সরকার ও দেশী এনজিও গুলোর সঙ্গে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।

৯.৭ সরকার নিয়ন্ত্রিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই গ্রামীণ দারিদ্র দূরীকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করে গ্রামীণ দুঃস্থ জনসাধারণের, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য কাজের সৃষ্টি ও আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা করে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন গ্রামীণ দারিদ্র দূরীকরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উপসংহার

উপরের আলোচানা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বাংলাদেশের জনসাধারণের এক বিরাট অংশ চরম দারিদ্রে জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। এ সকল বঞ্চিত নিঃস্ব ও অসহায় লোকজনকে উৎপাদনের হাতিয়ার করে তোলার জন্য "এখনই, পরে নয়" এ মানসিকতার ভিত্তিতে সরকার ও বিভিন্ন দেশীবিদেশী এনজিও কর্তৃক কার্যক্রম সাফল্য মন্ডিত করার জন্য আমাদের সকলকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। একটা কথা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে আমরা যদি আমাদের সাধারণ জনগণের জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হই তাহলে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এর জন্য আমাদের চরম মূল্য দিতে হতে পারে। সে সময় আসার পূর্বেই বাংলাদেশে বিদ্যমান দারিদ্রের অবসান করে বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে কার্যকর মানব সম্পদে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে আমাদের সকল প্রচেষ্টা নিবদ্ধ করতে হবে।

বিঃদ্রঃ প্রবন্ধটি বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের উন্নয়ন অর্থনীতি মডিউলে পাঠ্য বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

১। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর কর্মসূচি

(ক) সমন্বিত পল্লীউন্নয়ন প্রকল্প
(খ) দক্ষিণ –পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প
(গ) পল্লী উন্নয়ন–২ প্রকল্প
(ঘ) পল্লী উন্নয়ন–৫ প্রকল্প
(ঙ) পল্লী উন্নয়ন –৬ প্রকল্প
(চ) উত্তর –পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প
(ছ) নোয়াখালী পল্লীউন্নয়ন প্রকল্প

২। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

(ক) পল্লী সমাজ সেবা

৩। শিশু ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(ক) মহিলা কর্মসূচি

৪। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ঃ

(ক) বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি
(খ) বেকার যুবকদের আত্ম–উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান
(গ) থানায় মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান

৫। ত্রাণ মন্ত্রণলয়

(ক) পল্লী পূর্ত কর্মসূচি
(খ) কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি

৬। শিল্প মন্ত্রণালয়

(ক) মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি
(খ) পল্লী শিল্প বিকাশ
(গ) পার্বত্য চট্টগ্রামে কুটির ও গ্রামীণ শিল্প উন্নয়ন

৭। অন্যান্য কর্মসূচি	মন্ত্রণালয়
(ক) আদর্শ গ্রাম	ভূমি মন্ত্রণালয়

(খ) দুঃস্থ দল উন্নয়ন (ভিজিডি)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
(গ) অকৃষি কর্মসংস্থান সর্মসূচি	আন্তঃ মন্ত্রণালয়
(ঘ) গ্রামীণ ব্যাংক	অর্থ মন্ত্রণালয়

গ্রন্থপঞ্জি

১। হোসেন, আমজাদ, *বাংলাদেশের উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, ঢাকা, পটুয়া, ১৯৯৫।

২। সামাদ ,মুহাম্মদ, *বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্রমোচনে এনজিও ভূমিকা*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী ,১৯৯৪ ।

৩। রহমান, হোসেন জিল্লুর (সম্পাদিত) *মাঠ গবেষণ া ও গ্রামীণ দারিদ্র*, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৪ ।

৪। আহমেদ, নাসিরউদ্দিন ও তারেক, মোহাম্মদ (সম্পাদিত) , *উন্নয়ন অর্থনীতিঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

৫। তারেক ,মোহাম্মদ , *বাংলাদেশের দারিদ্র রেখা ও উত্তরণ প্রক্রিয়া*, নাসির উদ্দীন আহমেদ ও মোহাম্মদ তারেক সম্পাদিত উন্নয়ন অর্থনীতিঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, ঢাকা বাংলা একাডেমী ,১৯৯৩।

৬। সিদ্দিক, আবু বকর, *বাংলাদেশের পরিকল্পনায় দারিদ্র নিরসন কৌশল*, নাসিরউদ্দিন আহমেদ ও মোহাম্মদ তারেক সম্পাদিত উন্নয়ন অর্থনীতিঃবাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী , ১৯৯৩।

৭। বালা, হীরালাল, *বাংলাদেশের দারিদ্রঃ অতীত ও বর্তমান, সমস্যা ও সমাধান*, মোঃ মতিন সম্পাদিত বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা, ৪র্থ, বর্ষ, ২য় সংখ্যা, সাভার ঢাকা।

৮। UNDP, *Human Development Report*, 1994 Delhi, Oxford University PRESS, 1994.

৯। The World Bank, *Poverty Reductiom: Handbook* Washington, D.C. 1993

১০। রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, প্রথম খন্ড , তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা , ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৯৮০।

১১। রহিম, আব্দুর , *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস , প্রথম খন্ড (১২০৩-১৫৭৬)*, অনুবাদক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী , ঢাকা, প্যারাডইস প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৮২।